মায়ের খাদ্য ৬
...জেনিটাল ক্যাটারাক্ট ৮
স্বাস্থ্য কুইজ ৯
বয়ঃসন্ধিকাল ১২
সাপের কামড়ের প্রতিকার ১৬

ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেল্‌থ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ

বর্ষ ৮ সংখ্যা ১-২ শ্রাবণ-অগ্রহায়ণ ১৪০৬

ডেঙ্গু জ্বর এবং এর প্রতিকারের উপায়

এ.কে. সিদ্দিক

বর্তমানে বহুল আলোচিত ডেঙ্গু জ্বরের নাম নূতনভাবে শোনা গেলেও এ-রোগটি মোটেও নূতন নয়, বরং ম্যালেরিয়ার ন্যায় এটিও একটি প্রাচীন সংক্রামক ব্যাধি। সব ধরনের মানুষই এই দু'টি রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আসুন, আমরা এ-রোগ সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু জেনে নেই।

ডেঙ্গু জ্বর কি

ডেঙ্গু একটি ভাইরাস-জনিত ব্যাধি যা এডিস এজিপটি নামক এক ধরনের মশা দ্বারা বাহিত হয়। ডেঙ্গু জ্বর দু'ধরনের হয়—ডেঙ্গু জ্বর এবং ডেঙ্গু হেমোরহেজিক জ্বর।

কারা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি যারা বেশি ভ্রমন করে তারা ও শিশুরা এ-রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণু-বাহিত মশা কখন কামড়ায়

ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণু-বাহিত মশা খুব ভোরে এবং পড়ন্ত বিকেলে কামড়ায়।

ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণু-বাহিত মশার অবস্থান

ঘরের ভিতরে অন্ধকারে ও আবদ্ধ জায়গায় ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণু-বাহিত মশা থাকে। এছাড়া ঘরের বাইরে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও ছায়ায়ও এ-মশা থাকে। এ-মশার স্ত্রী প্রজাতি পানি পূর্ণ ফুলের টবে ডিম পাড়ে এবং ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার পর এক সপ্তাহ সেখানে অবস্থান করে। ডেঙ্গু জ্বরের মশার বংশ বিস্তারের উপযুক্ত জায়গা হলো পানি পূর্ণ পাত্র যা ছায়াযুক্ত কিংবা রৌদ্রোজ্জ্বল যেকোনো স্থানেই থাকুক না কেন, যেমন: ফুলের টব, ড্রাম, ট্যাংক, বোতল, ড্রেন, গাছের গুড়ির বিভিন্ন খাদ এবং অন্যান্য বিভিন্ন জায়গা যেখানে বৃষ্টির পানি জমা থাকতে পারে।

(১৪-এর পাতায় দেখুন)

ম্যালেরিয়া

নন্দিতা নাজমা ও মোহাম্মদ ইকবাল

ম্যালেরিয়া উন্নয়নশীল দেশসমূহের অন্যতম একটি প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা। ম্যালেরিয়া শব্দটি ইটালিয়ান শব্দ Mal (খারাপ) এবং Area (বাতাস) অর্থাৎ খারাপ বাতাস (bad air) থেকে এসেছে। অতীতে ধারণা করা হতো যে বদ্ধ ডোবার পচা পানির উপর দিয়ে যে খারাপ বাতাস প্রবাহিত হয় তা থেকে ম্যালেরিয়া রোগের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত উষ্ণমণ্ডলীয় এলাকা জুড়ে এ-রোগ বিস্তৃত। এসব এলাকার ১০৩টি দেশের প্রায় ২৫০ কোটি লোক ম্যালেরিয়ার ঝুঁকির মুখে আছে এবং এ-রোগের কারণে প্রতি বছর দশ থেকে ত্রিশ লক্ষ লোক মারা যায়। এই দেশগুলো এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় অবস্থিত।

বাংলাদেশে ম্যালেরিয়ার প্রেক্ষাপট

ষাটের দশকের শেষের দিকে ও সত্তর দশকের প্রথম দিকে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির অধীনে সারা দেশে ব্যাপকভাবে ডিডিটি পাউডার ছিটানোর ফলে আমাদের দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক কমে যায়। কিন্তু এই কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আশির দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশের পূর্ব ও উত্তর সীমান্ত এলাকায় আবার ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়। ১৯৯৪ সালে বান্দরবন, রাঙ্গামাটি, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা এলাকায় ম্যালেরিয়া মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল।

ম্যালেরিয়ার কারণ

ম্যালেরিয়া পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট এক ধরনের জ্বর। প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপ্যারাম, প্লাজমোডিয়াম ভাইভেক্স, প্লাজমোডিয়াম ওভেল ও প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি এই চার প্রজাতির পরজীবী ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ। স্ত্রী-জাতীয় এনোফিলিস মশা এই পরজীবীর বাহক। ম্যালেরিয়া পরজীবী এদের জীবন-চক্রের একটি অংশ এই মশার লালা গ্রন্থিতে ও অন্য অংশ মানুষের যকৃত ও লোহিত রক্ত কণিকায় কাটায় এবং বংশ বৃদ্ধি করে। পরজীবীবাহী স্ত্রী এনোফিলিস মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়। এছাড়া পরজীবী-সংক্রমিত রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে এবং ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত গর্ভবতী মা হতে গর্ভস্থ সন্তানের দেহে ম্যালেরিয়া সংক্রমিত হতে পারে। এমনকি জীবাণু-দুষ্ট ইনজেকশনের সূঁচের মাধ্যমেও ম্যালেরিয়া ছড়াতে পারে।

(১০-এর পাতায় দেখুন)

বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণ বর্তমান প্রেক্ষাপট

কাজি সেলিম আনোয়ার, প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত,
আজাহার আলী মোল্লা ও জি.এইচ. রাব্বানী

আর্সেনিক একটি বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদহীন রাসায়নিক পদার্থ। পৃথিবীর বহু দেশে বহুকাল থেকে মাটিতে, খনিতে বা শিলারাশির মাঝে ও ভূগর্ভস্থ পানিতে স্বল্প মাত্রায় আর্সেনিক বিদ্যমান আছে। আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার অনেক দেশের পানিতে কিছু-কিছু আর্সেনিক রয়েছে। তবে যখনই এর পরিমাণ সহনীয় মাত্রার বাইরে চলে যায়, তখনই তা জনস্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আর্সেনিক-দুষ্ট পানি পানের মাধ্যমেই মানুষ সাধারণত আর্সেনিক-জনিত রোগে আক্রান্ত হয়। দেহের প্রায় সব ক'টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই আর্সেনিক দূষণের প্রভাব ফেলে। ১৯৯৬ সাল থেকে বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ সহনীয় মাত্রার অধিক হওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের পরিবেশ আর্সেনিক-দূষণের শিকার হচ্ছে।

পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ এবং উহার প্রকারভেদ

আর্সেনিকের যেকোনো যৌগই মানবদেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। আর্সেনিক-দুষ্ট পানি পান করার মাধ্যমেই এই বিষ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। সাধারণত দেহে আর্সেনিক প্রবেশের পর আর্সেনিকের ধরন, গ্রহণের সময়কাল এবং উহার মাত্রার উপর এর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে। পানিতে আর্সেনিকের চার ধরনের যৌগের মধ্যে আর্সেনিক-ট্রাই-অক্সাইড সব চেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে যা সব চেয়ে বেশি বিষাক্ত। সাধারণত ২০০ থেকে ৩০০ মি.গ্রা. পরিমাণের আর্সেনিক-ট্রাই-অক্সাইডকে মারাত্মক জীবন-নাশক বিষ হিসেবে গণ্য করা হয়। মানবদেহে ২০ মি.গ্রা. আর্সেনিক প্রবেশ করলে তা জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের হিসেব অনুযায়ী খাবার পানিতে আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা হচ্ছে প্রতি লিটারে ০.০৫ মি.গ্রা. (৫ মা.গ্রা.) অথবা ৫০ পিপিবি। মানবদেহে বৃক্ক (কিডনি) এক দিকে যেমন আর্সেনিক নি:সরণের প্রধান পথ হিসেবে কাজ করে, অন্য দিকে ইহা পেন্টাভ্যালেন্ট আর্সেনিককে অধিকতর বিষাক্ত ট্রাইভ্যালেন্ট আর্সেনিকে পরিণত করে। দেহে আর্সেনিক প্রবেশের ৬ থেকে ২০ দিনের মধ্যে এর বিষক্রিয়া-জনিত কারণে হৃদপিণ্ডের মাংসপেশীর আবরণের প্রদাহ হতে পারে বলে উল্লেখ রয়েছে।

বাংলাদেশে আর্সেনিকের উৎপত্তি, কারণ ও ব্যাপ্তি

বাংলাদেশে আর্সেনিকের ভূতাত্ত্বিক উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় যে প্রাকৃতিক নিয়মেই এ-দেশের ভূগর্ভের পানিতে আর্সেনিক-পূর্ণ তলানি মিশেছে। এই প্রক্রিয়ায় সুক্ষ্ম লৌহ কণিকা অথবা শিলা ক্ষরণের ফলে আর্সেনিক পলিমাটিতে মিশে যায়। সময়ের সাথে-সাথে প্রাকৃতিক কারণেই বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। এতে লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণও কমে যায় এবং আশপাশের পানিতে আর্সেনিক ছড়িয়ে পড়ে।

বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ আর্সেনিক দূষণের শিকার। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের ৭টি জেলার অধিকাংশ নলকূপের পানিতে আর্সেনিক পাওয়া যায়। ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি এই দূষণের পরিধি ৫৯টি জেলাতে ছড়িয়ে পড়ে। টিউবওয়েলের পানি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে আমাদের দেশের মধ্যাঞ্চলসমূহে, পশ্চিমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পূর্বে ব্রাহ্মনবাড়িয়া পর্যন্ত আর্সেনিক দূষণ বিস্তৃত। এছাড়াও দেশের উত্তরাঞ্চল, উপকূলীয় এলাকা ও বৃহত্তর সিলেটে আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা জানা গিয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ আর্সেনিক কন্ট্রোল সোসাইটি (BACS)-পরিচালিত রাজশাহী জেলার অন্তর্গত চারঘাট থানার কয়েকটি গ্রামের প্রাথমিক জরিপ অনুযায়ী সেখানকার কিছু নলকূপের পানিতেও আর্সেনিক দূষণের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও BACS ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জরিপের মাধ্যমে ফরিদপুর, চাঁদপুর ও বরিশালের কিছু-কিছু এলাকায়ও আর্সেনিক দূষণের লক্ষণ পাওয়া গিয়েছে।

জনস্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের প্রভাব

১৯৯৬ সালে ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল ও নিপসম-এর কয়েকজন চিকিৎসক বাংলাদেশে প্রথম আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করেন। মাত্রাধিক আর্সেনিক দেহে প্রবেশ করলে বিভিন্ন প্রকারের স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং ইহা দেহের প্রায় সবক'টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। আর্সেনিক বিষক্রিয়া নির্ভর করে আর্সেনিকের যৌগ এবং তা দেহ থেকে নি:সরণের পদ্ধতি ও সময়ের উপর। শারীরিক

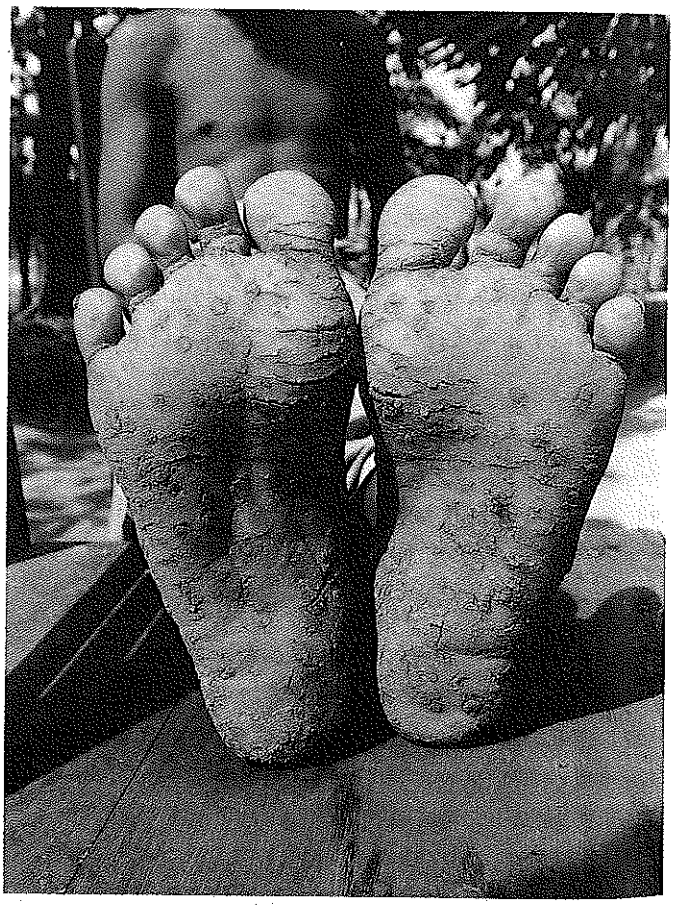

রাজশাহী জেলার চারঘাট থানাধীন একটি গ্রামে আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত একজন রোগীর পায়ের তলায় কেরাটোসিস (চর্মরোগ)

বাংলাদেশে আর্সেনিক সংক্রমণ

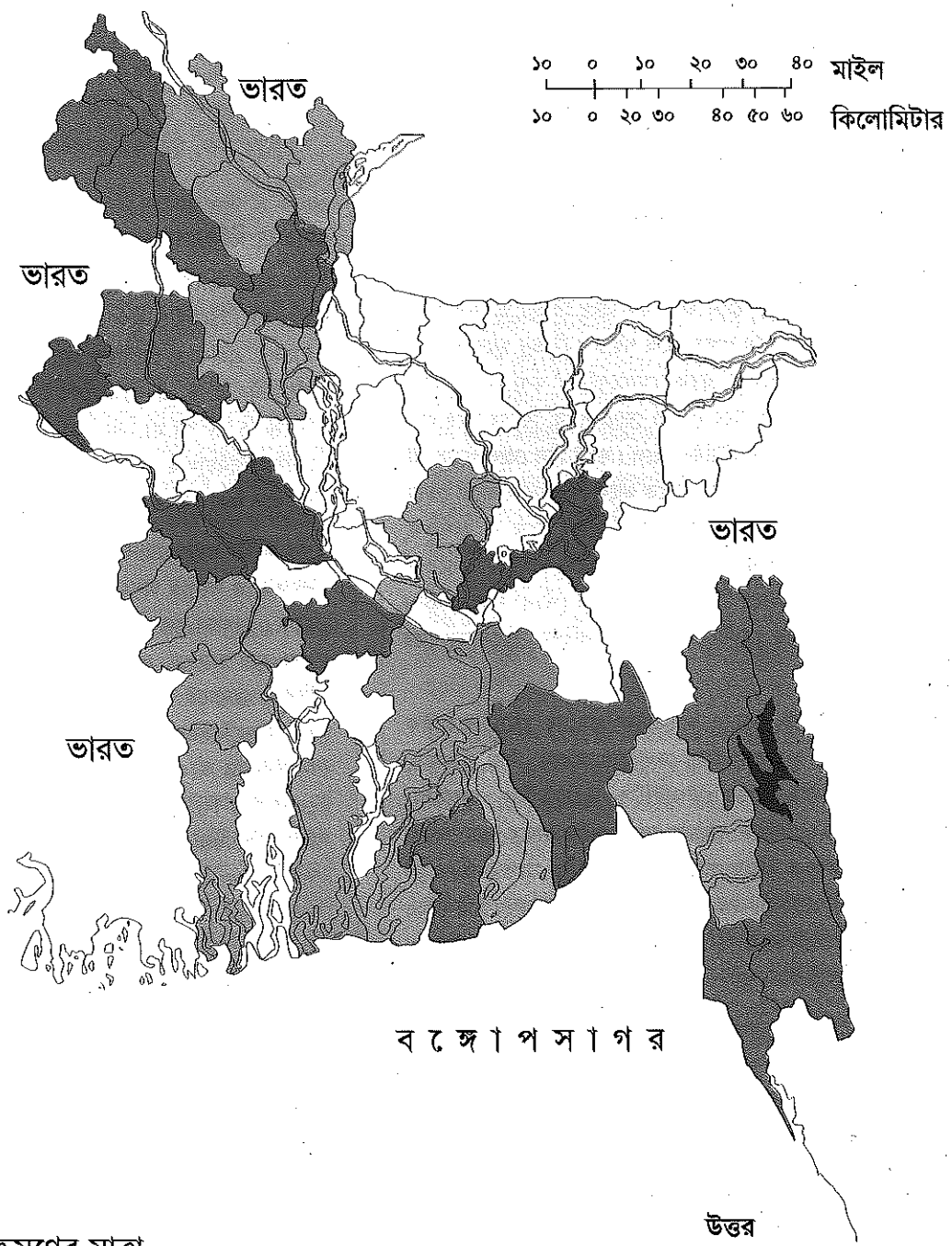

দাইনিচি কন্সালট্যান্ট ইনক, জাপান কর্তৃক ইন্টারনেটের ছবি অবলম্বনে অঙ্কিত এবং ছাপানোর জন্য বাংলাদেশ আর্সেনিক কন্ট্রোল সোসাইটি থেকে প্রাপ্ত

জৈবক্রিয়ার তথ্যানুসারে শতকরা ৪০ থেকে ৬০ ভাগ আর্সেনিক মানবদেহে অবস্থান করে। ফলে, অধিক আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করলে দেহে আর্সেনিকের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এছাড়াও এর ভৌত ও রাসায়নিক গঠন, দেহে প্রবেশের পথ, গ্রহণের মাত্রা, ব্যাপ্তিকাল ও রোগীর বয়সের উপর ভিত্তি করে বিষক্রিয়ার মাত্রা নির্ণয় করা যায়। সাধারণত দ্রবণীয় আর্সেনিক মানুষের শরীরে জমা না হয়ে বৃক্কের (কিডনি) ভিতর দিয়ে প্রস্রাবের সাথে বের হয়ে যায়। তবে যে-হারে শরীর থেকে আর্সেনিক নির্গত হয় তার চেয়ে অধিক হারে যদি তা পাকস্থলীতে প্রবেশ করে তাহলে তা চুল ও নখে জমতে থাকে।

আর্সেনিক বিষক্রিয়ার প্রকারভেদ ও লক্ষণ

দীর্ঘদিন যাবৎ খাবার পানির মাধ্যমে স্বল্পমাত্রায় আর্সেনিক গ্রহণ করতে থাকলে তা শরীরের বিভিন্ন স্থানে জমা হয় এবং বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। আর্সেনিক দূষণের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে শরীরের বিভিন্ন স্থানে চামড়ায় কালো-কালো দাগ দেখা দেওয়া, যাকে 'মেলানোসিস' বলা হয়। তাছাড়া চামড়া কোথাও-কোথাও শক্ত হয়ে ফুলেও যেতে পারে, বিশেষ করে হাত ও পায়ের তালুতে, যাকে 'কেরাটোসিস' বলে। যতই দিন যেতে থাকে এই লক্ষণগুলো ততই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মানবদেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেমন যকৃৎ, বৃক্ক ও ফুসফুস, ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা হচ্ছে চামড়ার ওপরে ও শরীরের ভিতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে টিউমার ও গ্যাংগ্রীন (পঁচন) দ্বারা আক্রান্ত হওয়া। আর্সেনিক-আক্রান্ত রোগীদের অনেকেই পরিণত বয়সে ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে।

স্বল্পকালের মধ্যে অধিক মাত্রায় আর্সেনিক গ্রহণের ফলে শারীরিক পরিবর্তনের যে লক্ষণ ও উপসর্গগুলো দেখা যায় তাহলো: বমি, রক্তবমি, জন্ডিস, আন্ত্রিক প্রদাহ, কনজাংটিভাইটিস, ব্রংকাইটিস, হৃদরোগ, স্নায়ুরোগ, ইত্যাদি। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগী মুখে ধাতব স্বাদ অথবা রসুনের মত গন্ধ অনুভব করতে পারে, শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে রোগীর মুখ শুকিয়ে যেতে পারে, ঢোক গিলতে তার কষ্ট হতে পারে, এবং রোগী বমিও করতে পারে। তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা এবং চাল ধোয়া পানির মত পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়ার লক্ষণসমূহও দেখা দিতে পারে।

তাৎক্ষণিকভাবে ৭০ থেকে ১৮০ মি.গ্রা. আর্সেনিক গ্রহণ জীবনের জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ণ। দীর্ঘ-মেয়াদকাল আর্সেনিক গ্রহণের ফলে রোগীর শরীরে কোনো লক্ষণ দেখা না দিলেও রক্ত, প্রস্রাব ও চুল পরীক্ষা করলে এর প্রভাব জানা যায়। দীর্ঘ-মেয়াদী আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় ত্বকে জটিল পরিবর্তনের কারণে চামড়ার কোষসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চাকচাক দাগের সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতে তা ক্যান্সারে রূপান্তরিত হতে পারে। দীর্ঘ-মেয়াদী আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার ফলে রক্তস্বল্পতা, লিউকোপেনিয়া, থ্রম্বোসইটোপেনিয়া ও এদের লক্ষণসমূহও দেখা দিতে পারে। এছাড়াও দুর্বলতা, বদহজম, অন্যমনস্কতা, ক্ষুধামন্দা, ওজন হ্রাস, চুল পড়া, ইত্যাদি উপসর্গসমূহ প্রকাশ পেতে পারে।

আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত ও আর্সেনিক-মুক্ত নিয়ন্ত্রিত এলাকার এক গবেষণা-লব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে দৈনিক এক মা.গ্রা. আর্সেনিক খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণের কারণে সারা জীবন চর্মরোগ ও ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। আর্সেনিক বিষক্রিয়ার কারণে চামড়া, ফুসফুস, মূত্রথলি ও বৃক্কের ক্যান্সার দেখা দেয়। আর্সেনিক বিষক্রিয়ার প্রভাবে গর্ভবতী মায়ের প্রসব-জনিত জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং অস্বাভাবিক গর্ভপাতও হতে পারে। ইহার প্রভাবে নবজাতক শিশু কম ওজন (<২,৫০০ গ্রাম) নিয়ে জন্ম গ্রহণ করতে পারে।

দেহে আর্সেনিক প্রবেশের ২ থেকে ৮ ঘণ্টার মধ্যে তা মূত্রাশয়ে চলে যায়, এবং শতকরা ২৫ ভাগ প্রথম দিনে এবং শতকরা ৭৫ ভাগ ৭ দিনের মধ্যে আস্তে-আস্তে তা দেহ থেকে নিঃসৃত হতে থাকে। তাই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংগৃহীত রক্ত, চুল ও নখ পরীক্ষা করে আর্সেনিক বিষের লক্ষণ জানা সম্ভব।

সম্ভাব্য চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

দীর্ঘ-স্থায়ী আর্সেনিক-আক্রান্ত রোগীকে চিলেটিং এজেন্ট দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। চিলেটিং এজেন্ট হিসেবে বৃটিশ এ্যান্টিলুইসাইড ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়াও রোগীকে আমিষ-সমৃদ্ধ খাদ্য ও এ্যান্টিঅক্সিডেন্টস্ (ভিটামিন এ, ই, ও সি) গ্রহণের উপদেশ দেওয়া হয়। আর্সেনিক-আক্রান্ত (রক্তে ১০০ মা.গ্রা.-এর কম আর্সেনিক) রোগীকে ২৫০ মি.গ্রা. পেনিসিলিনিয়াম ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পরপর সেবন করারও নির্দেশ দেওয়া হয় বলে তথ্য রয়েছে।

গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানি আর্সেনিক দূষণের ফলে সরকার ও সংশ্লিষ্ট জনস্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। যেখানে নলকূপের পানিই এদেশের প্রধান নিরাপদ পানি হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে, হঠাৎ সেই পানিই এখন সবচেয়ে মারাত্মক দূষণের শিকার হওয়াতে দেশীয়, আন্তর্জাতিক ও সরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন মহল খুব স্বাভাবিকভাবেই এতে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। তবে এ-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণকল্পে অহেতুক ভয়-ভীতি পরিহার করা প্রয়োজন এবং সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন মহলের কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় বিভিন্ন কার্যকর প্রকল্প বাস্তবায়ন করে খাবার পানির বিকল্প উৎস ও দূষিত পানি শোধন করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করা অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। বিকল্প পানির উৎস হিসেবে বেশ কিছু পদ্ধতি রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: (১) নদী, হ্রদ, পুকুর, ইত্যাদির পানি ফুটিয়ে জীবাণু-মুক্ত করে পান করা; (২) বৃষ্টির পানি নিরাপদ পাত্রে/ড্রামে সংগ্রহ করে পান করা; এবং (৩) প্রাচীনকালে ব্যবহৃত ৫-৬টি কলসীর স্তরের (বালু-খোয়া-পলি, ইত্যাদি) মাধ্যমে ছাকন পদ্ধতিতে সংগৃহীত পানি পান করা।

উপসংহার

আর্সেনিক-আক্রান্ত রোগীদের বিনা মূল্যে সঠিক চিকিৎসা করা ও তাদের আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের নিশ্চয়তা প্রদান করাও অতি প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশের ভূমণ্ডল ও প্রকৃতি থেকে আর্সেনিক দূষণের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের বিভিন্ন উপায়সমূহ উদ্ভাবন করে দেশের জনগণের বিশাল একটা অংশকে আর্সেনিক বিষক্রিয়ার হাত থেকে মুক্ত করা জরুরী হয়ে পড়েছে। তাই আর্সেনিক-মুক্ত পানি পাওয়ার উপায় বের করাও এ-সমস্যা সমাধানের একটি প্রধান উপায়। সকল স্তরের চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট কর্মীগণকে জনগণের সক্রিয় ভূমিকা ও সহযোগিতার মাধ্যমে আর্সেনিক রোগীর চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও বিকল্প পানির মাধ্যম হিসেবে পরিচালিত সকল কর্মকান্ডকে যথাযথভাবে সাহায্য প্রদান করাই হোক আমাদের সকলের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

ওপারের যাত্রী সুসমা ও একটি জিজ্ঞাসা

খালেদা বেগম

আড়াই বছরের অবুঝ শিশু সন্তান মিলটন। আজো সে তার মাকে খুঁজে ফিরে। খুঁজে ফিরে মায়ের উষ্ণ সান্নিধ্য। অথচ সে জানে না আমাদের এই পশ্চাদপদ সমাজ ব্যবস্থার শিকার তার মা সুসমা। আমি সেই সুসমার কথা বলছি।

অভয়নগর থানার মহাকাল ইউনিয়নের রামষড়া গ্রামের পল্লী চিকিৎসক মুরালীর মেয়ে সুসমা। চার ভাই-বোনের মধ্যে সে-ই বড়। কালো বর্ণের এই মেয়েটি বাবা-মার দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে অশনি সংকেতের মত বেড়ে উঠে। শৈশব ও কৈশোর পেরিয়ে যখন যৌবনে পা দেয় তখন তার বয়স ষোল। ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী।

এই সময় ষোড়শী সুসমার বিয়ে হয় পাশের গ্রামের অস্বচ্ছল পরিবারের এক অশিক্ষিত ছেলের সাথে। এক বুক অনাগত ভবিষ্যতের উজ্জল স্বপ্ন নিয়ে সুসমা সংসারের হাল ধরে। কিন্তু বিধি বাম। ছোট বেলা থেকেই সে দেখে আসছে নারী-পুরুষের বৈষম্য এবং পুরুষের হাতেই থাকে মানবীয় জীবন চাহিদার চাবিকাঠি। বিবাহিত জীবনে এসেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। নানা দুঃখ-কষ্ট ও গঞ্জনার মধ্য দিয়ে দু'বছর অতিবাহিত হলে কোলে আসে একটি পুত্র সন্তান। নাম তার মিলটন।

এখানেই ঘটনার শেষ নয়। ঘটনা গড়াতে থাকে কালের স্রোতে। দেড় বছর পর পুনরায় সে গর্ভধারণ করে। অস্বচ্ছলতার মধ্যে এই অবাঞ্ছিত-অনাকাঙ্খিত গর্ভকে নষ্ট করার জন্য স্বামী সিদ্ধান্ত নেয়। কেননা, এখানে পুরুষ-শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী জন্মদানের আধার মাত্র। অত:পর স্বামী গ্রামের এক কবিরাজের কাছ থেকে গাছের শিকড় এনে সুসমাকে দেয়। জরায়ুতে ঢুকিয়ে ভ্রুণ নষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয় এ-শিকড়। দু'দিন পর সুসমা তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে। প্রচুর রক্তপাতসহ গর্ভপাত হয়ে গেলেও সে ভীষণ জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ-অবস্থায় গ্রাম্য চিকিৎসকের চিকিৎসায় উপসমের সাময়িক লক্ষণ দেখা দিলেও ক্রমাগত জ্বর ও দুর্গন্ধযুক্ত স্রাবসহ ছয় দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সুসমার বাবাকে সংবাদ দেওয়া হয়। বাবা এসে দেখেন যমে-মানুষের টানাটানি। এই সংকটময় অবস্থা দেখে বাবা ভীষণ শংকিত হয়ে পড়েন এবং সুসমাকে বাড়ী নিয়ে যান। বাবার বাড়িতে যাওয়ার পর সুসমার খিচুনি শুরু হলে তাকে দ্রুত অভয়নগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। এখানে দু'দিন চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হলেও পুনরায় সে মারাত্মক শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়। ডাক্তারদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও সুসমার অবস্থার কোনো উন্নতি না হওয়াতে তাঁরা তাকে যশোর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু পথিমধ্যেই সুসমা তার গ্লানিময় জীবনের পাট চুকিয়ে ওপারে যাত্রা করে।

এখানে আমি তো শুধু সুসমার কথা বললাম। কিন্তু এছাড়া বিরামহীন এ-যাত্রার সহযাত্রী হয়েছে আছুরা, আঞ্জুরা, সালমা ও এ-দেশের নাম-না-জানা আরো অনেকে। আমরা কি বলতে পারি এ-যাত্রার শেষ কোথায়?

গর্ভপাতের ফলাফল

গর্ভপাত এমন একটি মারাত্মক ঝুঁকি যা পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার, গর্ভপাতের ফলে জটিলতার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং প্রদত্ত সেবার মান নিশ্চিত করতে পারলে আমাদের দেশে মায়েদের মৃত্যুর হার অনেকাংশে কমে যেতো। সারা বিশ্বে প্রতিদিন ১,৬০০ জন অর্থাৎ প্রতি বছর ৫,৮৪,০০০ জন মা গর্ভকালীন ও গর্ভপাতের জটিলতায় মারা যায়। বাংলাদেশে প্রতি বছর গর্ভ-জনিত কারণে প্রায় ২৮,০০০ হাজার মা মারা যায়। এর মধ্যে অধিক রক্তক্ষরণে ২৫%, জীবাণু সংক্রমণে ১৫%, একলামশিয়ায় ১২%, জটিল বা বাধাগ্রস্ত প্রসবের কারণে ৮%, গর্ভপাতের কারণে ২১% ও অন্যান্য (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) কারণে ১৯% মা মারা যায়। শতকরা ২১ ভাগ গর্ভপাত-জনিত কারণের মধ্যে শতকরা ১২ ভাগ মা মারা যায় অবৈজ্ঞানিক পন্থায় গর্ভপাত করানোর ফলে।

গর্ভকাল ও শিশু জন্মদান একজন মায়ের একটি আনন্দের বিষয়। কিন্তু যখন কোনো কারণে সেই মায়ের জীবনে এই গর্ভই অশনি সংকেত বয়ে আনে, তখনই একজন মা কোনো উপায়ান্তর না দেখে এ-ঝুঁকিপূর্ণ জটিল পথ অবলম্বন করে।

গর্ভপাতের পন্থাসমূহ

মূলত ৩টি প্রক্রিয়ায় গর্ভপাত কার্যকর হয়ে থাকে, যথা (১) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাদানকারীদের মাধ্যমে, (২) প্রশিক্ষণহীন সেবাদানকারীদের মাধ্যমে, এবং (৩) সনাতন পদ্ধতিতে।

যদিও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাদানকারীদের মাধ্যমে গর্ভপাত করানো হয় তথাপি তাঁদের উদাসীনতা, অবহেলা ও অর্থ লিপসা এই মৃত্যুর জন্য অনেকাংশে দায়ী। সনাতন পদ্ধতি বা প্রশিক্ষণহীন ব্যক্তির মাধ্যমে যেসব গর্ভপাত হয়ে থাকে সেগুলোর মধ্যে যদি একজন মায়ের মৃত্যু হয় তবে অন্তত ৫ (পাঁচ) জন মা মৃত্যু থেকে অব্যাহতি পেলেও বাকি জীবন তাঁদের শারীরিক অসুস্থতা, পঙ্গুত্ব, বা দুর্বিসহ যন্ত্রণা নিয়ে জীবন কাটাতে হয়।

উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল বাদে শুধুমাত্র এই যশোর জেলার অভয়নগর থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গর্ভ-জনিত ও গর্ভোত্তর (বিয়াল্লিশ দিনের মধ্যে) জটিলতার কারণে ১৯৯৭ সালে ৫২৫ জন মা ভর্তি হয়। তন্মধ্যে ১১৫ জন মা-ই এসেছিলেন গর্ভপাতের জটিলতার কারণে। এদের মধ্যে (ই.ও.সি-এর তথ্যানুযায়ী) হোমিও চিকিৎসক দ্বারা গর্ভপাতের দরুণ জটিলতা ছিল ৪.৩৪%; গাছের শিকড় দ্বারা গর্ভপাতের দরুণ জটিলতা ১৪.৭৮%; বনজ পাতার (কবিরাজী) বড়ি খেয়ে জটিলতা ৪.৩৪%; পল্লী চিকিৎসকের মাধ্যমে গর্ভপাতের জটিলতা ৬.৯৫%; ডাক্তার/এফডব্লিউভি দ্বারা জটিলতা ১৩.৪%; অসম্পন্ন গর্ভপাতের দরুণ জটিলতা ৪২.৬%; এবং অন্যান্য গর্ভপাতের দরুণ জটিলতা ১৩.৯১%।

গর্ভপাতের মূল কারণসমূহ

এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে সারা বিশ্বে ১৯৯৮ সালে অবৈধ গর্ভপাতের সংখ্যা ছিলো এক কোটি ৫০ লাখ অর্থাৎ প্রতি হাজারে ৩ জন। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের অবৈধ গর্ভপাত ছিল ৪০ লাখ। উন্নত দেশসমূহে গর্ভপাত কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু আমাদের মত এই উন্নয়নশীল দেশে যেখানে সমাজ এখনো ধর্মীয় অনুশাসনে বাধা ও সামাজিক কুসংস্কারে ভরা, বাল্য-বিবাহের কারণে গর্ভপাতের ঝুঁকি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবস্থা সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব, নারীদের শিক্ষার অভাব, এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে নারীদের অবমূল্যায়ন করা হয়, সেখানে গর্ভপাত বিষয়টি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে।

একথা অনস্বীকার্য যে আমাদের দেশে অবৈধ সন্তানদের কোনো আশ্রয় নেই। ফলে, কারো যদি ভুলবশত: কোনো দুর্ঘটনা ঘটে সেক্ষেত্রে এটাকে গোপনে সমাধান করার জন্য অবৈজ্ঞানিক পন্থায় গর্ভপাতের পথ অবলম্বন করা হয়।

অবাঞ্ছিত ও অবৈজ্ঞানিক গর্ভপাত রোধে করণীয়

অবাঞ্ছিত ও অবৈজ্ঞানিক গর্ভপাত রোধে নিম্নে উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

১. পরিবার কল্যাণ ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেবাদানের মান আরো উন্নত করতে হবে।

২. গর্ভপাতের ফলে জটিলতায় আক্রান্ত এবং এর সমাধানের দিকসমূহ পরিবার কল্যাণ সহকারীর মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করতে হবে।

৩. গর্ভপাতের জটিলতায় আক্রান্ত রোগীদের খুঁজে বের করে সেবা গ্রহণের জন্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র বা স্যাটেলাইট ক্লিনিকে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শীকা বা চিকিৎসা সহকারীর নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৪. পরিবার কল্যাণ পরিদর্শীকা ও চিকিৎসা সহকারীকে প্রয়োজনবোধে এ-ধরনের রোগীদের চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৫. গর্ভপাতের জটিলতা ও গর্ভপাতের পর পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার-সম্পর্কিত পোষ্টার, ফ্লিপচার্ট ও প্রচার অভিযানের মাধ্যমে জনগণকে স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ জটিলতার বিভিন্ন দিকসমূহ ও সমাধানের পথ-সম্পর্কিত জ্ঞান দান করতে হবে।

৬. পল্লী চিকিৎসক, প্রশিক্ষণহীণ দাই, বা অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে অবৈজ্ঞানিক উপায়ে গর্ভপাতের মারাত্মক জটিলতার দিকগুলো, যেমন জরায়ুর ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, পঙ্গু ও বন্ধ্যা হওয়া, ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোকপাত করে সম্যক জ্ঞান দিতে হবে।

উপসংহার

যেকোনো ধরনের গর্ভপাত রোধ করা প্রয়োজন। মৃত্যু, বিশেষ করে মায়ের অকাল মৃত্যু, সংসারে দুর্বিসহ পরিবেশ সৃষ্টি করে একটি সুন্দর সাজানো-গোছানো সংসারকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয় যা আমাদের কারোরই কাম্য নয়। তাই এদিকে সংশ্লিষ্ট সকলকে সবিশেষ নজর দিতে হবে।

গর্ভবতী মায়ের খাদ্য

আনোয়ারা হায়দার

বাংলাদেশে অপুষ্টি একটি মারাত্মক সমস্যা। পাঁচ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের মধ্যে শতকরা ৯৩ ভাগ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। নবজাত শিশুদের প্রায় শতকরা ৩৫ থেকে ৫০ ভাগ শিশু স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে কম (২.৫ কি.গ্রা.) ওজন নিয়ে জন্মায়। শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ মা ও শিশু রক্ত-স্বল্পতায় ভোগে। ৮ কোটিরও অধিক লোকের আয়োডিনের অভাব-জনিত সমস্যা রয়েছে। ৫ কোটিরও বেশি লোক দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান গলগণ্ড (goitre) রোগে আক্রান্ত রয়েছে। আর অপুষ্টির কারণে আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকের শারীরিক বৃদ্ধি ব্যহত হচ্ছে, তাদের ধীশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ক্ষমতা খর্ব হচ্ছে, এবং ক্রমান্বয়ে শিক্ষনের যোগ্যতা হ্রাস পাচ্ছে।

এসব সমস্যাবলী হতে রক্ষা পেতে হলে আমাদের প্রথম থেকেই প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে। মায়ের গর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় একটি শিশুর সমস্যাবলীর সূত্রপাত হতে পারে। একজন গর্ভবতী মা প্রয়োজন মাফিক সুষম খাদ্য খেলেই একটি সুস্থ-সবল শিশু জন্ম দিতে পারে বলে আশা করা যায়। গর্ভাবস্থা একটি বিশেষ অবস্থা। এ-সময় শরীরে মেটাবলিক ও হরমোনের পরিবর্তনের কারণে গর্ভস্থ ভ্রুণের সঠিক বৃদ্ধির জন্য সব খাদ্য-উপাদানের বর্ধিত চাহিদা মেটানোর প্রয়োজন। মায়ের বয়স ২২ বছরের কম হলে তার নিজের বৃদ্ধির জন্য বাড়তি খাবার প্রয়োজন হয়।

গর্ভকালীন সম্পূর্ণ সময়টাকে (৯ মাস) মোট তিনটি পর্যায়ে (ট্রাইমেষ্টার) ভাগ করা যায়: (১) প্রথম ট্রাইমেষ্টার (গর্ভধারণের প্রথম তিন মাস); (২) দ্বিতীয় ট্রাইমেষ্টার (পরবর্তী বা দ্বিতীয় তিন মাস); এবং (৩) তৃতীয় ট্রাইমেষ্টার (তিন মাস অর্থাৎ দ্বিতীয় তিন মাসের শেষ থেকে শিশুর জন্মদান সময় পর্যন্ত)।

গর্ভাবস্থায় মায়ের গ্রহণকৃত খাদ্য প্রয়োজনমত সুষম হলে স্বাভাবিকভাবেই একজন গর্ভবতী মায়ের শরীরের ওজন প্রায় ২৮ পাউন্ড পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। এই ওজন (২৮ পাউন্ড) সাধারণত শরীরের ঠিক কোন্-কোন্ অংশে বৃদ্ধি হতে পারে তা নিম্নে দেখানো হলো।

১.	ভ্রুণ	৭.০	পাউন্ড
২.	গর্ভফুল	১.৫	"
৩.	স্তন	২.০	"
৪.	জরায়ু	২.৫	"
৫.	রক্ত	৩.০	"
৬.	অ্যামনিউটিক ফ্লুইড	৩.০	"
৭.	গর্ভবতী মায়ের শরীর	৯.০	"

তবে এ-বৃদ্ধি নির্ভর করে মায়ের পুষ্টিগত অবস্থার উপর। পুরো গর্ভাবস্থায় একজন মায়ের অতিরিক্ত ৮০,০০০ কিলোক্যালোরি প্রয়োজন অর্থাৎ একজন গর্ভবতী মাকে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ কিলোক্যালোরির অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। বিভিন্ন পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমেই একজন মাকে এই বাড়তি ক্যালোরির প্রয়োজন মেটাতে হবে।

একজন গর্ভবতী মা যার এখন প্রয়োজন পুষ্টিকর খাবার ও মানসিক প্রফুল্লতা

গর্ভবতী মায়ের ওজনের এই স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি খাদ্য উপাদান, যেমন কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন, ভিটামিন, ইত্যাদি কোন্‌টা কি পরিমাণে খেতে হবে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

ক্যালোরি: গর্ভাবস্থায় প্রথম ৩ মাসে ক্যালোরি বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। তবে ২য় ও ৩য় মাসে অতিরিক্ত ২০০ কিলোক্যালোরি গ্রহণ করতে হবে। যদি কোনো মা গর্ভাবস্থায় শারীরিক পরিশ্রম খুব কমিয়ে দেন তবে তাঁর জন্য ক্যালোরি বৃদ্ধি করার তেমন প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু মা যদি পূর্বের মতই শারীরিক পরিশ্রম করতে থাকেন, তাহলে ভ্রুণ ও জরায়ুর বৃদ্ধির জন্য প্রথম থেকেই ৩০০ ক্যালোরি বাড়াতে হবে।

আমিষ (প্রোটিন): গর্ভাবস্থায় হরমোনের কারণে ধনাত্বক নাইট্রোজেন ব্যালেন্স থাকে। কোনো-কোনো মায়ের টিস্যু বৃদ্ধির জন্য আমিষ প্রয়োজন। বাকিটা লাগে ভ্রুণের বৃদ্ধির জন্য। তাই প্রথম থেকেই প্রতিদিন ১০ গ্রা. আমিষ বেশি খেতে হয়। তার জন্য মাকে ডিম, মাছ, মাংস, দুধ ও ডাল স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে একটু বেশি পরিমাণে খেতে হবে।

শর্করা (কার্বোহাইড্রেট): প্রথম থেকেই ১০০ গ্রা. বাড়ালেই যথেষ্ট। গর্ভস্থ ভ্রূণ গর্ভফুলের মাধ্যমে শুধুমাত্র গ্লুকোজ থেকেই শক্তি নিয়ে থাকে। ভ্রূণ চর্বি-জাতীয় খাবার ভেঙে শক্তি নিতে পারে না বিধায় এ-সময়ে মাকে একটু বেশি পরিমাণে ভাত, রুটি, আলু, মুড়ি, বা চিড়া খেতে হবে। এসব খাবারই হতে পারে গ্লুকোজ-এর উৎস, যা থেকে ভ্রূণ প্রয়োজনীয় শক্তি পেতে পারে।

চর্বি (ফ্যাট): ঘনীভূত শক্তির উৎস হচ্ছে ফ্যাট। এক গ্রাম ফ্যাট থেকে যেখানে ৯ কিলোক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায়, সেখানে এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থেকে ৪ কিলোক্যালোরি ও এক গ্রাম প্রোটিন থেকে ৪ কিলোক্যালোরি পাওয়া যায়। কাজেই গর্ভবতী মাকে তার খাদ্যের বাড়তি শক্তি পূরণের জন্য ফ্যাট গ্রহণের পরিমাণ সামান্য বাড়াতে হবে। ফ্যাটের প্রধান উৎস হচ্ছে তেল, ঘি, ও মাখন। চর্বিযুক্ত মাংস, মাছ, ডিম, ইত্যাদি থেকেও ফ্যাট পাওয়া যায়।

সহজলভ্য কিছু আয়রন ও শর্করা-জাতীয় খাবার

ভিটামিন: গর্ভাবস্থায় সব বয়সের মায়েদের প্রতিদিন অতিরিক্ত ৫,০০০ আই.ইউ. ভিটামিন এ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ভিটামিন এ ভ্রূণের শরীরে জমা হয়। এছাড়াও অন্যান্য আরো যেসব ভিটামিন একজন গর্ভবতী মায়ের গ্রহণ করা উচিত তা এখানে উল্লেখ করা হলো: প্রতিদিন অতিরিক্ত ২০০ আই.ইউ. ভিটামিন ডি গ্রহণ করতে হবে, কারণ গর্ভাবস্থায় বাড়তি ক্যালসিয়ামকে শরীরের কাজে লাগানোর জন্য ভিটামিন ডি দরকার। ফলিক এসিড স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ গ্রহণ করতে হবে। প্রতিদিন প্রায় ৮০০ মি.গ্রা. ফলিক এসিড, ১.৪ মি.গ্রা. থায়ামিন ও ১.৬ মি.গ্রা. রিবোফ্লাভিনও গ্রহণ করতে হবে। ভিটামিন কে গর্ভাবস্থার শেষের দিকে দেওয়া হয়। ফলে ভ্রূণের শরীরে প্রোথ্রমবিন তৈরি হবে। এসব ভিটামিন পাওয়ার জন্য মাকে বেশি করে শাক-সবজি এবং নানা ধরনের ফল খেতে হবে।

খনিজ পদার্থ: গর্ভাবস্থায় খনিজ পদার্থের শোষণ বৃদ্ধি পায়। একটি পুরো সময়ের (৪০ সপ্তাহ) ভ্রূণের শরীরে প্রায় ২৮ গ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। ভ্রূণের শরীরের কাঠামো তৈরির জন্য ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন হয়। তাই গর্ভবতী মাকে বাড়তি ৪০০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম গ্রহণ করা দরকার। বেশিরভাগ ক্যালসিয়াম পাওয়া যাবে দুধ থেকে। তাছাড়া প্রতিনিয়ত ডিম, ছোট মাছের মাথা ও কাটা, ইত্যাদি খেয়েও এর অভাব দূর করা যায়।

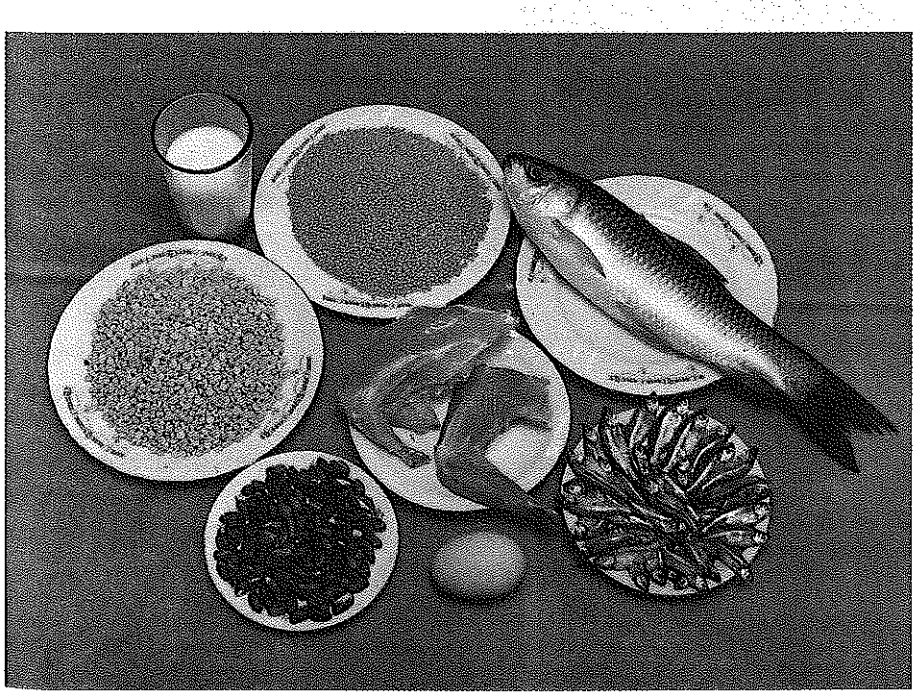

চিত্রে আমিষ-জাতীয় খাবারের নমুনা

আয়রন: ভ্রূণের শরীরে রক্ত তৈরির জন্য প্রায় ৩৭৫ মি.গ্রা. এবং মায়ের শরীরে বাড়তি রক্ত তৈরির জন্য ৬০০ মি.গ্রা. আয়রন দরকার। তাই প্রত্যহ বাড়তি আয়রন বড়ি থেকে নিতে হবে, তা না-হলে গর্ভবতী মা রক্তশূন্যতায় (এ্যানিমিয়া) ভুগবেন। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যহ ১৮ মি.গ্রা. আয়রন দরকার। আর ২য় ট্রাইমেষ্টার-এ ৩০ মি.গ্রা. দরকার হয় এবং ৬০ মি.গ্রা. দরকার হয় ৩য় ট্রাইমেষ্টার-এ। এজন্য মাকে আয়রন-সমৃদ্ধ খাবার, যেমন প্রানিজ উৎস থেকে কলিজা, ডিম, মাংস, ইত্যাদি এবং উদ্ভিদ উৎস থেকে বিভিন্ন শাক-সবজি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পরিমাণে খেতে হবে।

আয়োডিন: প্রত্যহ ১২৫ মি.গ্রা. আয়োডিন দরকার এবং প্রতিদিন এ-পরিমাণ আয়োডিন গ্রহণ করলে মা ও শিশু দু'জনেই গয়টার রোগ থেকে মুক্ত থাকবে। তাই গর্ভবতী মাকে নিয়মিত আয়োডিনযুক্ত লবন খেতে হবে।

(১৪-এর পাতায় দেখুন)

কন্‌জেনিট্যাল্ ক্যাটার‍্যাক্ট কান্না-হাসির গল্প

মমতাজ বেগম, মহ্সীন আহ্মেদ ও
মোঃ আবু সাঈদ

যশোর জেলার অভয়নগর থানার বাঘুটিয়া ইউনিয়নের একটি গ্রাম মধ্যপুর। ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসের ২ তারিখে আমরা এ-নিবন্ধের প্রথম দু'জন লেখক মধ্যপুরের স্যাটেলাইট ক্লিনিকে যাই। এখানে উল্লেখ্য যে অভয়নগর থানা, বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং আইসিডিডিআর,বি-এর অপারেশন্স রিসার্চ প্রজেক্ট-এর যৌথ উদ্যোগের একটি মাঠ এলাকা। ঐদিন এক মা তাঁর বাচ্চাকে নিয়ে ক্লিনিকের এফডব্লুউভি-এর নিকট আসেন। এফডব্লুউভি বাচ্চাটিকে আমাদের দেখান।

বাচ্চাটির অসুবিধার ধরন দেখে আমরা তাকে ফলো-আপ করার সিদ্ধান্ত নেই। প্রথম দিন হতে অর্থাৎ ২ থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত আমরা মোট ১৪ বার বাচ্চাটির বাড়িতে গিয়ে তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা করি। পরবর্তীতে বাচ্চাটির সমস্যার ব্যাপারে চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা: মো: আবু সাঈদের (৩য় লেখক) সংগে আলোচনা করি। সম্পূর্ণ বিষয়টি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

বাচ্চাটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি মেয়ে। ১৯৯৬ সালের ২৩ নভেম্বর তার জন্ম হয়। আমাদেরকে প্রথম যেদিন তাকে দেখানো হয় তখন তার বয়স ছিলো সাড়ে সাত মাস। সে জন্ম থেকেই চোখে দেখে না। বাচ্চাটি গর্ভে থাকার ১-৪ মাস পর্যন্ত মায়ের প্রায়ই রক্ত বমি হতো। গর্ভধারণের ৬ মাস পর মায়ের হাতে-পায়ে পানি নামে। পুরো সময় গর্ভে থাকার পর স্থানীয় একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে সিজারিয়ান অপারেশনে বাচ্চাটির জন্ম হয়। জন্মের পর থেকেই মা বাচ্চাটির দু'চোখের মনির মাঝে সাদা পর্দার মত একটা কিছু দেখতে পান। প্রথমদিকে মা ধারণা করেন যে চোখের এই পর্দা এমনিতেই চলে যাবে। কিন্তু বাচ্চার ৬ মাস বয়স পর্যন্ত যখন তার চোখের পর্দা সরে গেল না তখন মা-বাবা চিন্তিত হয়ে ওঠেন। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ কেউ-কেউ কোনো কবিরাজকে দেখাতে বলেন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে প্রথমে স্থানীয় একজন ডাক্তার এবং পরবর্তীতে খুলনায় বিএনএসবি-পরিচালিত শিরোমনী চক্ষু হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসাপাতাল থেকে বাচ্চাটিকে ভিটামিন এ দেওয়া হয় এবং এক বছর বয়স পূর্ণ হলে অপারেশনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়।

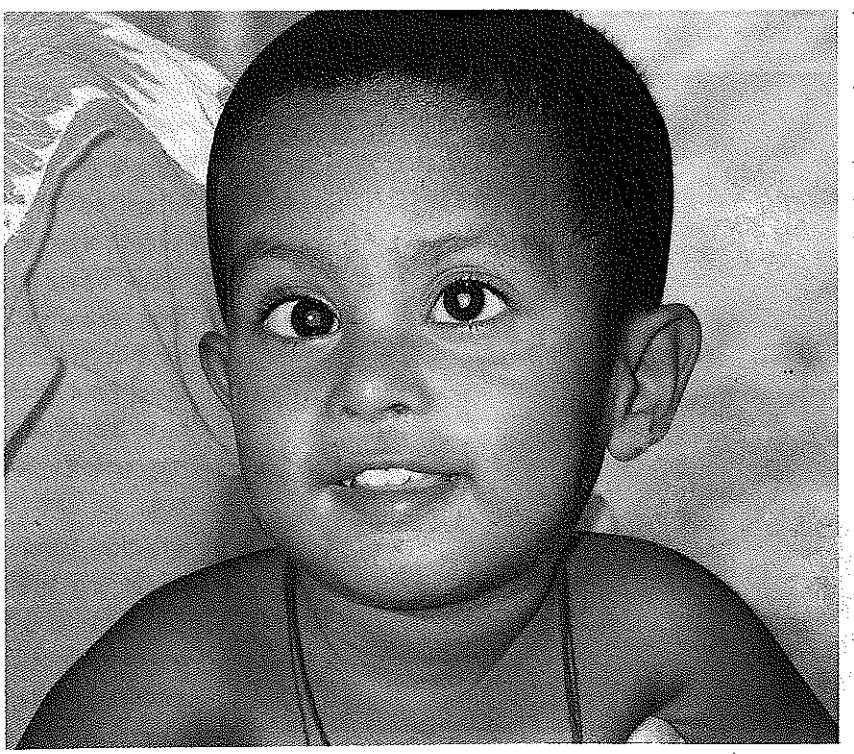

অপারেশনের পূর্বে তোলা বাচ্চাটির ছবি। এতে তার দু'চোখের ক্যাটার‍্যাক্ট স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে

আমরা বাচ্চাটিকে পরীক্ষা করে দেখতে পাই যে তার দু'টি চোখেই ছানি পড়েছে। টর্চের আলোর দিকে সে চোখ ফেরায় এবং ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বললে চমকে ওঠে। আমরা বুঝতে পারি যে ছানি বা ক্যাটার‍্যাক্ট অপারেশন করলে সে দেখতে পাবে।

বাচ্চাটির বয়স এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে তার মধ্যে আরো দু'টি উপসর্গ দেখা দেয়। সে সূর্যের আলোয় তাকাতে পারে না এবং তার চোখ দু'টি বেশ চুলকায়। শিরোমনী চক্ষু হাসপাতাল থেকে soframycin eye drop ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। চোখের ড্রপ ২ মাস ব্যবহার করা হয়। ইতোমধ্যে মা-বাবা তাকে এক কবিরাজ এবং স্থানীয় এক পীর সাহেবের কাছেও নিয়ে যান। কবিরাজ সাহেব একটি গাছের পাতা দিয়ে বাচ্চার পায়ে নিয়মিত ঘষতে পরামর্শ দেন। পীর সাহেব পানি পড়ে দেন এবং সেই সাথে চক্ষু হাসপাতালে নেওয়ার জন্য তাগিদ দেন।

এক বছর পূর্ণ হয়ে যাবার পরও মেয়েটিকে চক্ষু হাসপাতালে নেওয়া হয়নি। ঘনিষ্ঠজনরা সবাই অপারেশন করাতে নিরুৎসাহিত করেছেন। মা জানান যে তাঁর স্বামীও আর আগের মত সাহস পাচ্ছেন না। এরপর মা-বাবা উভয়েই আমাদের এড়িয়ে চলতে চান। আমরা বাড়িতে গেলে ব্যস্ততা দেখিয়ে তাঁরা পাশের বাড়িতে চলে যান। আমরা ঘনিষ্ঠজনদের সাথে কথা বলি। তাঁদের কাছে জানতে পাই যে মা-বাবা বাচ্চাটিকে খুলনার দুলগা নামক স্থানে একজন মহিলা ফকিরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহিলা ফকির ঝাড়-ফুঁক দিয়ে সব ভাল হয়ে যাবে বলে বলেছেন।

ইতোমধ্যে মেয়েটির বয়স ২ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। সে এখন কথা বলতে শিখেছে। চোখে দেখে না, কিন্তু অনুমান করে সারা বাড়ি হেঁটে বেড়ায়। অপারেশনের প্রসঙ্গ তুললেই মা-বাবা এড়িয়ে যান। মেয়েটির বয়স যখন আড়াই বছর তখন একদিন স্থানীয় কয়েকজন মুরুব্বীর সহায়তায় বাড়ির উঠানে বসে তার মা-বাবাকে পুনরায় বুঝানো হয়। তার মা-বাবাকে বলা হয় যে একটি মেয়ে সন্তান অন্ধ হিসেবে বড় হলে জীবনটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। অথচ অপারেশনের মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব।

অবশেষে ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে খুলনার শিরোমনী চক্ষু হাসপাতালে বাচ্চাটির একটি চোখের ছানির অপারেশন করা হয়। ৬ মাস পর অন্য চোখের অপারেশন করা হবে। হাসপাতালে আসার পর বাচ্চাটিকে ঘরের বারান্দায় দৌড়াতে দেখা গেলো। মা-বাবার, মেয়েটির এক ভাইয়ের এবং সদ্য অপারেশন করা মেয়েটির চোখে-মুখে এখন আনন্দ ও তৃপ্তি।

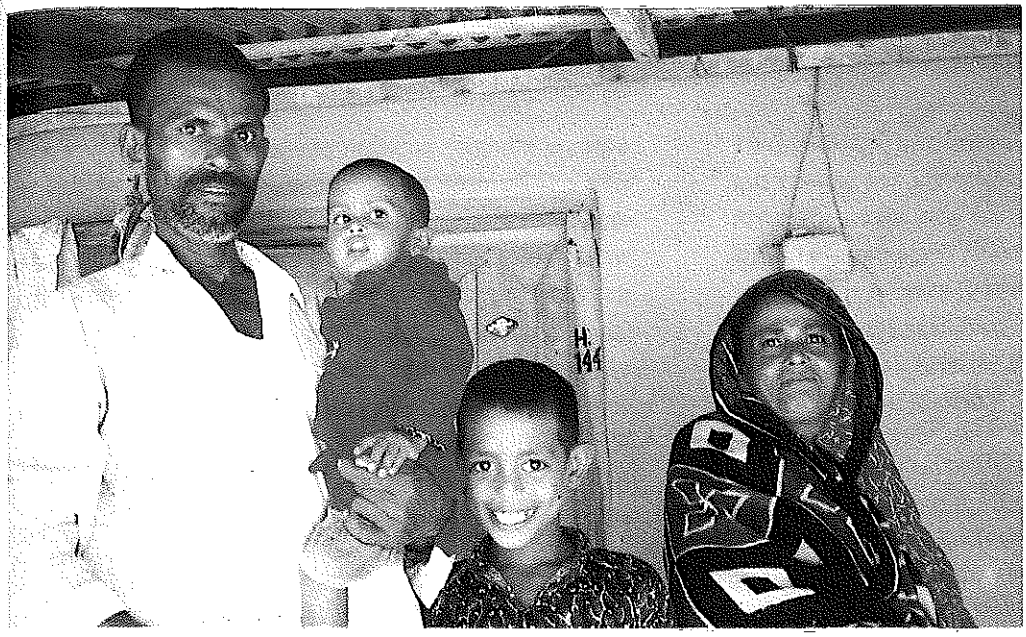

অপারেশনের পরে পরিবারের মাঝে শিশুটি

ডা: মো: আবু সাঈদ এ-সম্পর্কে বিজ্ঞান-ভিত্তিক তথ্য সরবরাহ করেন। তিনি জানান: আমাদের দু'টি চোখে স্বচ্ছ লেন্স আছে। লেন্সের ভিতর আলোর প্রবেশ আমাদের দেখতে সহায়তা করে। কোনো কারণে এই লেন্সের স্বচ্ছতা নষ্ট হলে সাধারণভাবে আমরা এ-অবস্থাকে ছানি পড়া বলে থাকি। বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে ছানি পড়ার কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। তবে শিশুদের বেলায়ও এমন হতে পারে। এমনকি মায়ের গর্ভ থেকেই চোখে ছানি পড়া অবস্থায় শিশুর জন্ম হতে পারে। একে জন্মগত ছানি (congenital cataract) বলা হয়ে থাকে। শিশুরা যেসব কারণে অন্ধ হয়ে থাকে কন্‌জেনিট্যাল্ ক্যাটার‍্যাক্ট (১৪%) তার মধ্যে অন্যতম।

কন্‌জেনিট্যাল্ ক্যাটার‍্যাক্ট-এর কারণ কি

প্রথমেই যে কথাটা বলা প্রয়োজন তাহলো আরো অনেক রোগের মত এক্ষেত্রেও সঠিক কারণগুলো পুরোপুরি এখনো নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে যেসব শিশুর জন্ম-ওজন কম এবং কোনো মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম গ্রহণ করে তাদের মধ্যে কন্‌জেনিট্যাল্ ক্যাটার‍্যাক্ট-এর হার বেশি। এ-পর্যন্ত যেসব কারণগুলো নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে তাহলো: (১) গর্ভাবস্থায় মায়ের সংক্রমণ (রুবেলা বা জার্মান মিজল্‌স); (২) গর্ভবতীর পুষ্টিহীনতা; (৩) গর্ভাবস্থায় ওষুধের (কর্টিসন, থেলিডেমাইড) প্রতিক্রিয়া; (৪) গর্ভাবস্থায় জটিলতা (গর্ভফুল থেকে রক্তপাত); (৫) মায়ের ডায়বেটিস রোগ; (৬) বংশগত; এবং (৭) বিবিধ সিনড্রোম (ডাউন্‌স সিনড্রোম, ওয়ারনার সিনড্রোম)।

বিশেষজ্ঞগণ চোখের এমন অবস্থায় ব্যবস্থাপনার পূর্বে তিনটি মৌলিক বিষয় যাচাই করেন: প্রথমটি, রোগীর চোখের অবস্থা কেমন; দ্বিতীয়টি, রোগীর সার্বিক অবস্থা (দৈহিক ও মানসিক) কেমন; এবং তৃতীয়টি, অপারেশন পরবর্তী যত্নের প্রতি মা-বাবার মনোবল কেমন। তবে চোখের অবস্থার উপর নির্ভর করে অপারেশনের বিভিন্নতা হয়ে থাকে। যেমন: (১) যদি উভয় চোখে পরিপক্ক ছানি (matured cataract) পড়ে থাকে তাহলে জন্মের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অপারেশন করা প্রয়োজন; (২) যদি উভয় চোখে অপরিপক্ক ছানি(immatured cataract) পড়ে থাকে এবং রোগী স্বল্প দূরত্বে ভাল দেখতে পান তাহলে অপারেশনের জন্য বিলম্ব করা যেতে পারে; এবং (৩) যদি শুধুমাত্র এক চোখে ছানি পড়ে থাকে তাহলে জন্মের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অপারেশন করা জরুরী।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন কোনো রোগীর খোঁজ পেলে তাকে চক্ষু হাসপাতালে বা বিশেষজ্ঞের কাছে প্রেরণ করাই হবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরামর্শ।

স্বাস্থ্য কুইজ ২৫

১. এইচআইভি এবং এইড্‌স-এর মধ্যে পার্থক্য কি?

২. এইচআইভি এবং এইড্‌স কিভাবে ছড়ায়?

৩. বাংলাদেশে "এআরআই"-এর গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো কি কি?

৪. "দীর্ঘ-স্থায়ী ডায়রিয়া" কাকে বলে?

৫. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে মারাত্মক নিউমোনিয়া কাকে বলে?

(উত্তর আমাদের কাছে ৩০ এপ্রিল ২০০০ সালের মধ্যেই পৌছাতে হবে।)

স্বাস্থ্য কুইজ ২৪-এর উত্তর

১. গর্ভকালীন সময়ে মায়ের ওজন ন্যূনতম ৭ কেজি বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন।

২. যক্ষার প্রধান লক্ষণ দীর্ঘ-স্থায়ী কাশি এবং ৩ সপ্তাহের বেশি স্থায়ী জ্বর। অন্যান্য তিনটি লক্ষণ হচ্ছে: রক্ত মিশ্রিত থুথু, বুকের ব্যথা, ও ওজন কমে যাওয়া।

৩. জন্মের পর থেকে ২ বছর বয়সের মধ্যে শিশুর মস্তিষ্কের (brain) বৃদ্ধি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

৪. কুষ্ঠ রোগের প্রাথমিক তিনটি লক্ষণ হচ্ছে:
   * ত্বক ফ্যাকাশে অথবা লাল-লাল দাগের উৎপত্তি যেখানে রোগী স্পর্শ, ব্যথা, ও তাপ অনুভব করে না বা খুব কম অনুভব করে।
   * ঘাম না হওয়া।
   * ত্বকের ভিতরের দিকে গোটা হওয়া বা স্নায়ু শক্ত হয়ে যাওয়া।

৫. আমাশয় রোগের চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ৪টি মূল বিষয় হচ্ছে:
   * উপযুক্ত ঔষধ
   * পানীয়/প্রয়োজনীয় তরল খাবার
   * খাদ্য ও পুষ্টি
   * পরবর্তী পর্যবেক্ষণ (follow-up)

(স্বাস্থ্য কুইজ ২৪-এর সবক'টির সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারেন নি।)

ম্যালেরিয়া

(১ম পাতার পর)

ম্যালেরিয়ার লক্ষণ

রোগের লক্ষণ রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। যেসব লোক ম্যালেরিয়া-প্রবণ (এনডেমিক) এলাকায় বাস করে তাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্ম নেয়। তবে যারা এসব এলাকার বাইরে বাস করে তাদের এ-রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না। তাদেরকে non-immune বলে। আর এদের ক্ষেত্রে রক্তে স্বল্প সংখ্যক পরজীবীর উপস্থিতিতে ম্যালেরিয়ার লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে, যারা ম্যালেরিয়া-প্রবণ এলাকায় বাস করে তাদের মধ্যে যখন পর্যাপ্ত সংখ্যক পরজীবী রক্তে উপস্থিত থাকে তখন রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

প্লাজমোডিয়াম ভাইভেক্স, ওভেল ও ম্যালেরি দ্বারা সৃষ্ট ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ সাধারণত একই ধরনের হয়। প্রথম দিকে অনির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ থাকে, যেমন জ্বর-জ্বর ভাব, শরীর ব্যথা, ও পেটে অস্বস্তি। এরপর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর শুরু হয়। এ-জ্বরে সাধারণত নিম্নে উল্লিখিত তিনটি ধাপ থাকে।

ঠান্ডা ধাপ: শীত লাগা ও কাঁপুনির মাধ্যমে এ-জ্বর শুরু হয়। আক্রান্ত ব্যক্তি কয়েক মিনিট থেকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত জ্বরে কাঁপতে পারে।

গরম ধাপ: শীতে কাঁপুনির পর জ্বর আসে। শরীরের তাপমাত্রা ৪০°সে. পর্যন্ত বা তারও বেশি বেড়ে যায়। এক পর্যায়ে নাড়ী ও শ্বাসের গতি বেড়ে যায়, মাথা ও শরীর ব্যথা হয়, এবং কখনো-কখনো পেটে ব্যথা ও বমিও হতে পারে। জ্বর বেশি হলে রোগী প্রলাপ বকতে পারে। এই ধাপ ৩ থেকে ৬ ঘণ্টা স্থায়ী হয়।

ঘামানো ধাপ: রোগী প্রচন্ড ঘামতে শুরু করে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। রোগী দুর্বল বোধ করে ও প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে।

যকৃত ও প্লীহা বড় হয় এবং রক্ত স্বল্পতা দেখা দেয়। শিশুদের ক্ষেত্রে ফ্যালসিপ্যারাম-জনিত ম্যালেরিয়ার এই তিনটি ধাপ স্পষ্টরূপে দেখা দেয় না।

জটিল ম্যালেরিয়া

প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপ্যারাম দ্বারা জটিল ম্যালেরিয়া সৃষ্টি হয়। কিছু জটিল অবস্থার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো।

সেরেব্র্যাল্ ম্যালেরিয়া: সেরিব্র্যাল্ ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে রোগী জ্বরের সাথে-সাথে জ্ঞানও হারিয়ে ফেলতে পারে। খিঁচুনী হতে পারে অথবা অর্ধেক শরীর অবশ হয়ে যেতে পারে। ফুসফুসে পানি জমতে পারে (পালমোন্যারি ইডিমা) এবং জন্ডিস ও রক্ত স্বল্পতা হতে পারে। অনেক সময় প্রচণ্ড ডায়রিয়া ও বমির কারণে রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গিয়েও রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

ব্লাকওয়াটার ফিভার: এটিও অত্যন্ত জটিল অবস্থা। লোহিত রক্ত কণিকা ভেঙে রোগীর বৃক্ককে আক্রান্ত করে। ফলে, যেসব লক্ষণগুলো দেখা দেয় তাহলো: জ্বরের সাথে কালো রঙের প্রস্রাব হওয়া; অল্প পরিমাণে প্রস্রাব হওয়া; এবং এমনকি প্রস্রাব বন্ধ হয়ে বৃক্ক নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ট্রপিক্যাল স্প্লীনোমেগালী সিনড্রোম (Tropical splenomegaly syndrome): এ-ধরনের জটিলতা সাধারণত ম্যালেরিয়া-প্রবণ (এনডেমিক) এলাকায় দেখা যায়। এক্ষেত্রে রোগীর রক্ত স্বল্পতার সাথে-সাথে প্লীহার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে।

গর্ভবতী মহিলা ও ম্যালেরিয়া

গর্ভাবস্থায় মহিলাদের ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় গর্ভের সময় এ-রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা সব চেয়ে কম থাকে। গর্ভবতী মহিলাদের প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপ্যারাম ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। সেরিব্র্যাল্ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত গর্ভবতীদের মৃত্যুর হার শতকরা ৪০ ভাগ যা অন্যান্য মহিলাদের চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে থাকে। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলাদের হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা রক্তে চিনি কমে যাওয়া, পালমোন্যারি ইডিমা ও তীব্র এ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এছাড়াও অন্যান্য যেসব বিপদের সম্ভাবনা আছে সেগুলো হলো: (১) মাতৃ-মৃত্যু, (২) গর্ভপাত, (৩) মৃত বাচ্চা প্রসব, (৪) জন্মকালীন কম ওজন, এবং (৫) ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত বাচ্চা প্রসব।

রোগ নির্ণয়

রোগীর সঠিক ইতিহাস গ্রহণ, শারীরিক পরীক্ষা ও ল্যাবরেটরী পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা হয়।

ল্যাবরেটরী পরীক্ষা

রক্তের নির্দিষ্ট কয়েকটি সাধারণ পরীক্ষার (thin film ও thick film) মাধ্যমে ম্যালেরিয়া পরজীবী পরীক্ষা করা হয়। প্রয়োজন হলে রক্তের বিশেষ-বিশেষ পরীক্ষা ও অন্যান্য কিছু আনুষঙ্গিক পরীক্ষাও করা হয়।

চিকিৎসা

আমাদের দেশে প্রায় সর্বক্ষেত্রে প্লাজমোডিয়াম ভাইভেক্স, ওভেল ও ম্যালেরি এবং কিছু-কিছু ক্ষেত্রে প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপ্যারাম ক্লোরোকুইন সেনসেটিভ। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত প্রথম তিনদিন নির্ধারিত মাত্রার ক্লোরোকুইন ও চতুর্থ দিন প্রাইমাকুইন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

গর্ভবতী মহিলাদের ম্যালেরিয়া হলে যেসব বিপদের সম্ভাবনা থাকে সেগুলো সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তাই সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে রোগীর দ্রুত চিকিৎসা করতে হবে এবং সাথে ফলিক এসিডও দিতে হবে। ক্লোরোকুইন-রেজিস্ট্যান্ট (ক্লোরোকুইন দিয়েও যখন কাজ হয় না) ম্যালেরিয়া হলে রোগীকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-সুপারিশকৃত ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা পদ্ধতি বিভিন্ন ছকে পরের পাতায় দেওয়া হলো।

প্রতিরোধ

মশা ঝোপ-ঝাড়ে বাস করে এবং মজা পুকুর, পচা ডোবা, পানি অথবা জলাবদ্ধ ড্রেন, পানি জমা ভাঙ্গা হাড়ি, বোতল, টিনের কৌটা, ডাব-নারকেলের খোল, ইত্যাদিতে ডিম পাড়ে। মশার জন্ম ও বিস্তার রোধ করতে হলে মশা জন্মাবার স্থান নষ্ট করতে হবে। প্রথমেই দেখতে হবে কোথাও যেন ময়লা পানি বদ্ধ অবস্থায় না থাকে। মজা পুকুর ও পচা ডোবা সংস্কার করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার করতে হবে। রাতের বেলা মশারি টানিয়ে ঘুমাতে হবে। সরকারের সহযোগিতায় কোনো-কোনো এলাকায় মশারিতে ডেল্টামেথ্রিন প্রয়োগ করে মেডিকেটেড করতে হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করে অংশগ্রহণমূলক মশা-নিধন কর্মসূচি পুনরায় চালু করতে হবে।

নিম্নে ম্যালেরিয়ার বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হলো, যা মেডিক্যাল অফিসারগণ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন

চিকিৎসা 'এ'

দিন	ঔষধ	ওজন (কি.গ্রা.)							
		৩-৫	৬-৯	১০-১৪	১৫-১৯	২০-২৯	৩০-৩৯	৪০-৪৯	৫০+
প্রথম	ক্লোরোকুইন ট্যাব ১৫০ মি.গ্রা. বেস	১/৪	১/২	১	১	১১/২	২	৩	৪
দ্বিতীয়	ক্লোরোকুইন	১/৪	১/২	১	১	১১/২	২	৩	৩
তৃতীয়	ক্লোরোকুইন	১/৪	১/২	১	১	১১/২	২	২	৩
চতুর্থ	প্রাইমাকুইন (ট্যাব ১৫ মি.গ্রা.)	-	১/৪	১/২	১/২	১	১১/২	২	৩
ক্লোরোকুইন: মোট ডোজ = ২৫ মি.গ্রা./কি.গ্রা. ওজন									

চিকিৎসা 'এ' প্রয়োগে রোগী ভালো না হলে নিম্নে বর্ণিত চিকিৎসা 'বি' পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

চিকিৎসা 'বি'

দিন	ঔষধ	ওজন (কি.গ্রা.)							
		৩-৫	৬-৯	১০-১৪	১৫-১৯	২০-২৯	৩০-৩৯	৪০-৪৯	৫০+
প্রথম	কুইনিন দিনে ৩ বার (ট্যাব ৩০০ মি.গ্রা. সালফেট)	১/৪	১/৪	১/২	১/২	১	১১/২	২	২
দ্বিতীয়	কুইনিন দিনে ৩ বার	১/৪	১/৪	১/২	১/২	১	১১/২	২	২
তৃতীয়	কুইনিন দিনে ৩ বার	১/৪	১/৪	১/২	১/২	১	১১/২	২	২
	ফেন্সিডার এক ডোজ	১/৪	১/২	১	১	১১/২	২	২১/২	৩
চতুর্থ	প্রাইমাকুইন এক ডোজ (ট্যাব ১৫ মি.গ্রা.)	-	১/৪	১/২	১/২	১	১১/২	২	৩
কুইনিন: ১০ মি.গ্রা./কি.গ্রা. ওজন ৮ ঘন্টা অন্তর-অন্তর									

বিশেষত, ফ্যালসিপ্যারাম ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে কুইনিন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। কুইনিনের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ক্লোরোকুইন-এর চেয়ে বেশি। পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে কুইনিনের মাত্রা অর্ধেক করে দিতে হয়।

গুরুতর ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে পরের কলামে উল্লিখিত চিকিৎসা পদ্ধতি (চিকিৎসা 'সি') ব্যবহার করা যেতে পারে।

চিকিৎসা 'সি'

১. প্রারম্ভিক মাত্রা (loading dose)

গুরুতর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে সবসময় ২০ মি.গ্রা. লবণ/কি.গ্রা. ওজন কুইনিন ডাইহাইড্রোক্লোরাইড দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে। এ-ঔষধ ৫% ডেক্সট্রোজ স্যালাইনের মাধ্যমে ৪ ঘণ্টা ব্যাপী শরীরে প্রবেশ করাতে হবে। (৫-১০ মি.লি./কি.গ্রা. ওজন, রোগীর শরীরের সর্বময় তরলের ভারসাম্যতার উপর নির্ভর করবে।) যদি কুইনিন ডাইহাইড্রোক্লোরাইড স্যালাইনের মাধ্যমে সাথে-সাথে দেওয়া সম্ভব না হয়, তবে সমপরিমাণ ডোজ মাংসপেশীতে ইন্‌জেকশনের মাধ্যমে অবশ্যই দিতে হবে। কুইনিনের ডোজকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রতিটি ভাগ দু'টি উরুর সম্মুখভাগে ৬০ মি.গ্রা./মি.লি. ঘনত্বে দেওয়া যেতে পারে। শিরার মাধ্যমে কুইনিন ইন্‌জেকশন কখনো দেওয়া উচিত নয়। কারণ, শিরায় ইন্‌জেকশনের কারণে অনেক সময় রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে।

ঔষধের তালিকা

ওজন (কি.গ্রা.)	কুইনিন স্যালাইন/ পেশীতে ইন্‌জেকশন ৬০ মি.গ্রা./মি.লি. ৮-১২ ঘণ্টা পরপর	কুইনিন ট্যাবলেট দিনে তিনবার	ফেন্সিডার ট্যাবলেট এক ডোজ	প্রাইমাকুইন ট্যাবলেট এক ডোজ
৩	১/২ মি.লি.	১/৪	১/৪	-
৪-৫	১ মি.লি.	১/৪	১/৪	-
৬-৯	১১/২ মি.লি.	১/৪	১/৪	১/৪
১০-১৪	২ মি.লি.	১/২	১	১/২
১৫-১৯	৩ মি.লি.	১/২	১	১/২
২০-২৪	৪ মি.লি.	১	১১/২	১
২৫-২৯	৫ মি.লি.	১	১১/২	১
৩০-৩৯	৬ মি.লি.	১১/২	২	১১/২
৪০-৪৯	৭-৮ মি.লি.	১১/২	২১/২	২
৫০+	১০ মি.লি.	২	৩	৩

২. পরবর্তী নিয়মিত মাত্রা (maintenance dose)

প্রথম ডোজ শুরু করার ১২ ঘণ্টা পর ১০ মি.গ্রা. লবন/কি.গ্রা. ওজন ডোজে কুইনিন দিতে হবে। এ-ডোজ উপরের মত ঘনত্বে ডেক্সট্রোজ স্যালাইনের মাধ্যমে চার ঘণ্টা ব্যাপী অথবা মাংসপেশীতে ইন্‌জেকশনের মাধ্যমে দিতে হবে। পূর্ববর্তী স্যালাইনের সময় হিসেব করে এ-ধরনের ডোজ প্রতি ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা অন্তর-অন্তর রোগীকে দিতে হবে, যতক্ষন না রোগী মুখে ঔষধ গ্রহণ করতে পারে। কুইনিন ট্যাবলেট পরবর্তী ৩ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে। তিন দিনের দিন সে যখন মুখে খেতে পারবে তখন ফেন্সিডারের একটি ডোজ দিতে হবে। ফেন্সিডার দেওয়ার একদিন পরে প্রাইমাকুইনিন-এর একটি ডোজ দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে গর্ভবতী মাকে ও শিশু যাদের ওজন ৫০ কি.গ্রা.-এর কম তাদেরকে প্রাইমাকুইন দেওয়া যাবে না।

বয়:সন্ধিকাল

নাফিসা লিরা হক ও মেঘলা ইসলাম

ইংরেজিতে যাকে আমরা 'Adolescence' বলি, বাংলায় তারই আভিধানিক অর্থ হলো 'বয়:সন্ধিকাল'। যখন একটি শিশু শৈশবকাল পেরিয়ে যৌবনে পদার্পন করে তখন এই শৈশব ও যৌবনকালের মধ্যে তার বেশ কিছু শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হয়। এ-পরিবর্তনগুলো তাকে শিশু থেকে একটি পূর্ণ বয়স্ক মানুষে রূপান্তরিত করে। শৈশব ও যৌবনের এই সন্ধিক্ষণকেই আমরা বয়:সন্ধিকাল বলি।

যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১০ থেকে ১৯ বছর সময়টাকে বয়:সন্ধিকাল বলে চিহ্নিত করেছে, তবুও বিভিন্ন দেশের সামাজিক পটভূমিতে এ-সংজ্ঞার তারতম্য হতে পারে। এছাড়া এ-সময়ে একজন মানুষের যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়, ব্যক্তি ভেদে এ-পরিবর্তনগুলো ঘটার সময়ের কিছু হেরফের হতে পারে। আমাদের দেশে কৈশোরকালকে বয়:সন্ধিকালের সমার্থক হিসেবে গণ্য করা হয় এবং যে ছেলে বা মেয়ে এ-সময়কাল অতিক্রম করে তাকে কিশোর বা কিশোরী বলা হয়।

বয়:সন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে দু'ধরনের (শারীরিক ও মানসিক) পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এসব পরিবর্তনের মধ্যে কিছু-কিছু পরিবর্তন সকলের দৃষ্টিগোচর হয়, যেমন দ্রুত লম্বা হওয়া, দ্রুত ওজন বাড়া, এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লোম গজানো। এছাড়া ছেলেদের ক্ষেত্রে গলার স্বর পরিবর্তন হওয়া, লিঙ্গ বড় হওয়া, এবং দাড়ি গোঁফ গজানো, এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিক হওয়া ও স্তন বড় হওয়া অন্যতম। কিশোর-কিশোরীদের মন-মানসিকতা ও মেজাজের বিশেষ পরিবর্তন হয়। এরা হয়ে পড়ে কৌতুহল-উদ্দীপক, স্বাধীনচেতা, ও সংবেদনশীল। বেশিরভাগ সময়ে এরা বাবা-মায়ের চেয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সময় কাটাতে বেশি পছন্দ করে। এদের আচরণ হয়ে পড়ে অদ্ভুত—কখনো তারা অমনোযোগী, উচ্ছৃঙ্খল বা স্বাধীনচেতা, আবার কখনো তারা শান্ত, নম্র ও ভদ্র।

এই কৈশোরকাল মানব জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। জীবনের কঠিন বাস্তবতার সাথে পরিচয় হয় এই কৈশোরকালে। আধো-আধো জানার মধ্য দিয়ে কৈশোরকালের স্বাভাবিক পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে ছেলে-মেয়েদের মাঝে একটা ভ্রান্ত ধারণার জন্ম নেয়।

কিশোর-কিশোরীদের সম্বন্ধে সম্প্রতি সমাপ্ত আইসিডিডিআর,বি-এর অপারেশন্স রিসার্চ প্রজেক্ট-এর এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে 'মাসিক' যা কিনা বয়:সন্ধিকালে কিশোরীদের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ শারীরিক পরিবর্তন এ-ব্যাপারে অনেকেই অজ্ঞ থাকে। কিশোরীদের যাদের এখনো মাসিক হয়নি তাদের মধ্যে কেবলমাত্র শতকরা ৩৪ জন মাসিক সম্পর্কে জানে। এই না-জানার ফসল হিসেবে বেশিরভাগ সময়ই মেয়েরা প্রথম মাসিকের সময় ভয় পায় এবং তাদের জন্য কি করণীয় তা বুঝতে পারে না। তাছাড়া এ-সময়ে পরিবারের সদস্যরা তাদের চলাফেরা ও খাওয়া-দাওয়ার উপর আরো নানা ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং এসব বিধি-নিষেধ এই স্বাভাবিক পরিবর্তনকে আরো জটিল করে তোলে।

একইভাবে ছেলেদের ক্ষেত্রে বীর্যপাত হওয়া—যা চলতি ভাষায় 'স্বপ্নদোষ' হিসেবে পরিচিত—বয়:সন্ধিকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক পরিবর্তন। কৈশোরকালের আরেকটি বিশেষ পরিবর্তন হচ্ছে যৌন উত্তেজনা অনুভব করা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিশোররা এ-ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে বলে তারা মানসিক অশান্তিতে ভুগতে থাকে। বর্তমানে প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থায় স্কুল কিংবা পরিবার থেকে এসব বিষয়ে কোনো শিক্ষা বা পরামর্শ দেওয়া হয় না। আইসিডিডিআর,বি-এর অপারেশন্স রিসার্চ প্রজেক্ট-এর গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে দেখা যায় যে কিশোররা এ-ধরনের শারীরিক পরিবর্তনগুলো নিয়ে সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আলোচনা করে এবং বিভিন্ন ছোট-ছোট পুস্তিকা হতে এসব তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ-ধরনের আলোচনা ও তথ্য ভুল-ভ্রান্তিতে ভরপুর থাকে। এই ভুল তথ্যসমূহের প্রভাবে ছেলেরা তাদের এই হঠাৎ পরিবর্তনগুলো সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ে। অনেকেই এ-ধরনের আচরণসমূহকে অসুস্থতার লক্ষণ মনে করে এর চিকিৎসার জন্য তারা বিভিন্ন সনাতনী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়।

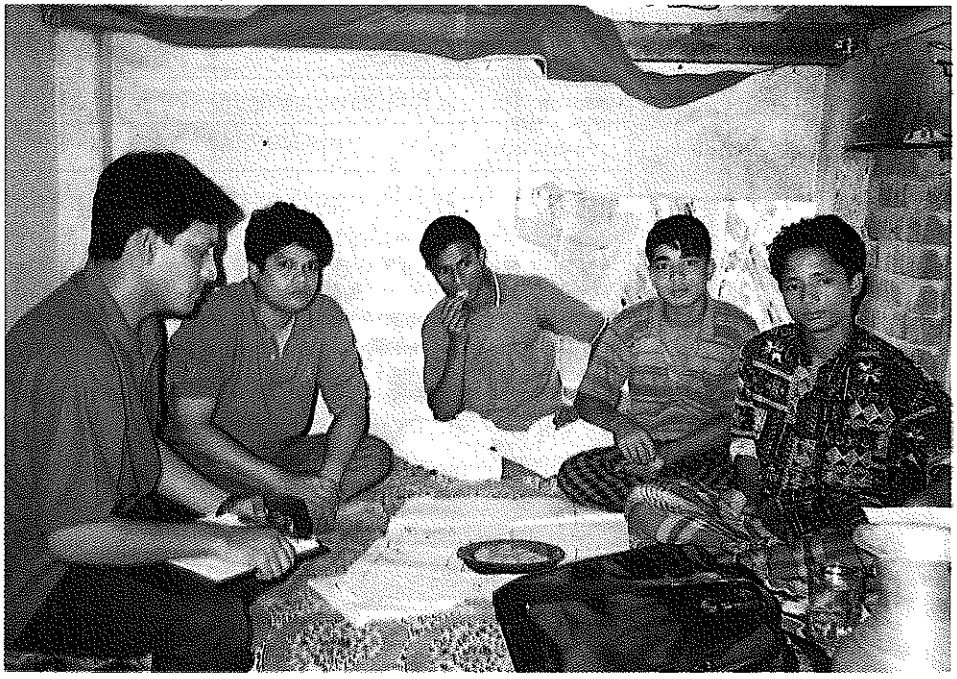

আইসিডিডিআর,বি-এর গবেষকরা কিশোরদের সাথে আলোচনা করছেন

বাংলাদেশের কিশোরীদের নিয়ে একটি উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে তাদের অল্প বয়সে বিয়ে হওয়া। কিশোরীদের একটি সুন্দর ও সুস্থ জীবনের প্রস্তুতি নিতে-না-নিতেই গুরুজনরা তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেন। ফলশ্রুতিতে একটি মেয়েকে সংসারের অনেক গুরু দায়িত্বের ভার নিতে হয় এবং অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যার অনেক সমাধানই তাদের অজানা। এছাড়া পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের অজ্ঞতা, বিধি-নিষেধ, পদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা একটি কিশোরী বউকে

অপরিণত শরীরে সন্তানের জন্ম দিতে বাধ্য করে। ফলশ্রুতিতে অনেক ক্ষেত্রেই তারা অপুষ্ট সন্তানের জন্ম দেয় এবং গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন সময়ে নানা ধরনের জটিলতায় আক্রান্ত হয়। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কিশোরী মাকে এ-ধরনের জটিলতার কারণে পৃথিবী হতে বিদায় নিতে হয়।

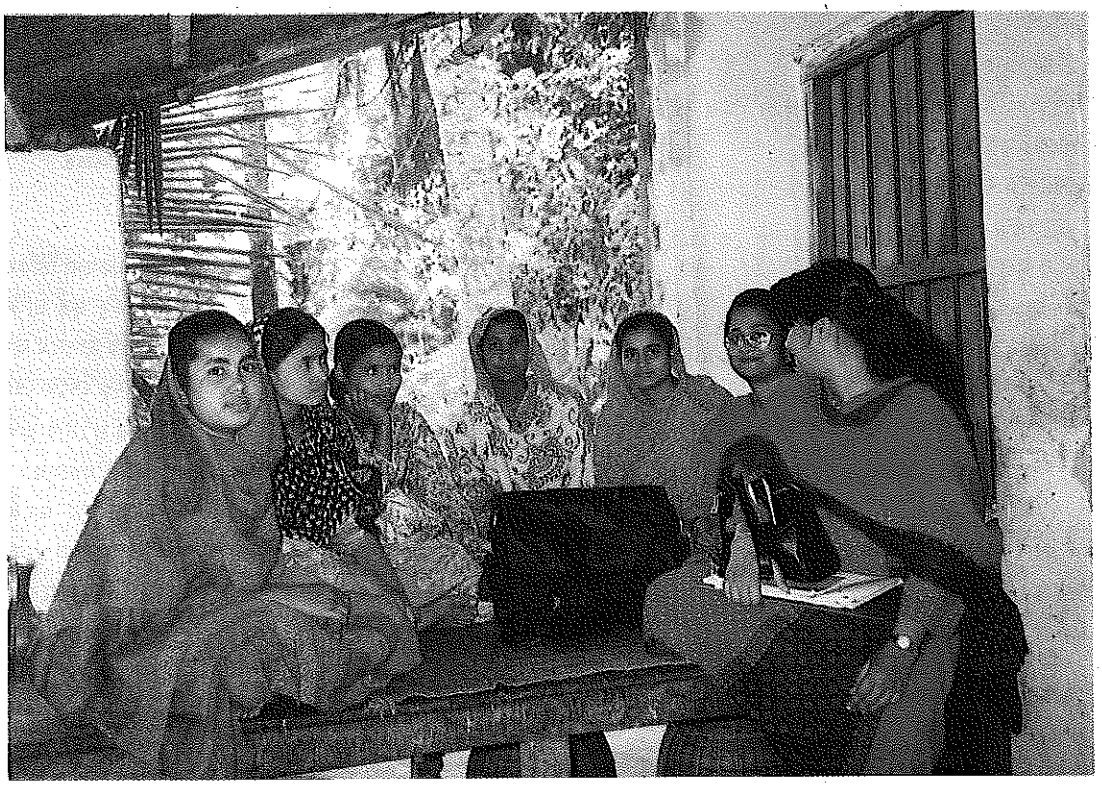

আলোচনারত কিশোরী মেয়েরা

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে সমগ্র বিশ্বে যৌনরোগে আক্রান্ত নারী-পুরুষদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই অল্পবয়সী কিশোর-কিশোরী। আইসিডিডিআর,বি-এর অপারেশন্স রিসার্চ প্রজেক্ট-এর গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে দেখা যায় যে যৌন-বাহিত রোগ সম্বন্ধে কিশোর-কিশোরীদের কোনো স্বচ্ছ ধারণা নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা যৌন-বাহিত রোগসমূহকে সনাক্ত করতে পারে না। যারা সনাক্ত করতে পারে তাদের অনেকেই কিভাবে এ-রোগ ছড়ায় বা এর প্রতিকার কি সে-সম্পর্কে অজ্ঞ। এদের মধ্যে কেউ-কেউ এ-রোগকে 'খারাপ রোগ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং 'খারাপ জায়গায়' অর্থাৎ পতিতালয়ে যাওয়াটাকেই এই ধরনের রোগের মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। যদিও বাংলাদেশের রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহ-বহির্ভূত যৌন-সম্পর্ক গ্রহণযোগ্য নয়, তথাপি বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে এ-ধরনের যৌন-সম্পর্ক সমাজে বিরাজমান।

পপুলেশন কাউন্সিল-এর একটি গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে ১৮-বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শহর এলাকার ৮৮ শতাংশ অবিবাহিত কিশোরদের এবং ৩৫ শতাংশ অবিবাহিত কিশোরীদের বিবাহ-বহির্ভূত যৌন-সম্পর্কের অভিজ্ঞতা আছে। অন্যদিকে গ্রাম এলাকার ৩৮ শতাংশ অবিবাহিত কিশোর এবং ৬ শতাংশ অবিবাহিত কিশোরীরাও এ-ধরনের যৌনকাজে লিপ্ত। আইসিডিডিআর,বি-এর গবেষণায়ও দেখা যায় যে অনেক কিশোর ঝুঁকিপূর্ণ যৌন কাজে লিপ্ত, যেমন কনডম ছাড়া যৌনকর্মী এবং সমলিঙ্গের সহিত যৌন-সম্পর্ক স্থাপন। এ-ধরনের পরিস্থিতি কিশোরদের যৌনরোগের ক্ষেত্রে তাদের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানকে আরো ভয়াবহ করে তুলছে।

এখন দেখা যাক, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নকল্পে কি ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে বা হচ্ছে। যদিও আশির দশকে বেশ কিছু বেসরকারি স্বাস্থ্য সংস্থা কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ-কর্মসূচিগুলো খুব অল্পসংখ্যক কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ে প্রকল্পের কাজ শুরু করেছিল, তথাপি এ-ব্যাপারে বেসরকারি উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এসব কর্মসূচির মধ্যে কিশোর-কিশোরীদের জন্য পারিবারিক শিক্ষাসহ ঋণদান প্রকল্প, আয়মূলক কর্মসূচি, ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ অন্যতম।

অন্যদিকে সরকারি উদ্যোগে বিগত বছরগুলোতে কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য-বিষয়ক কোনো কর্মসূচি ছিল না বললেই চলে। সনাতনী স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সেবাদানের প্রধান লক্ষ্য ছিল মা ও শিশু। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সমস্যা তেমন কোনো গুরুত্ব পেতো না। এসব সমস্যা বিবেচনা করে বর্তমানে Health and Population Sector Programme (HPSP)-এর আওতায় কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য-উন্নয়ন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে একটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির অধীনে সকল সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কিশোর-কিশোরীদের সব ধরনের তথ্য ও স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হবে। এ-লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে।

পরিশেষে আমরা আশা ব্যক্ত করব যে কিশোর-কিশোরীদের জীবনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে সেসব কর্মসূচি সময়ের দাবিতে আরো নূতন-নূতন বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করবে এবং এ-ধরনের কর্মসূচির আওতাভুক্ত হয়ে বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীরা নিজেদেরকে একজন স্বাস্থ্য-সচেতন ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে।

ডেঙ্গু জ্বর

(১ম পাতার পর)

ডেঙ্গু জ্বর কিভাবে ছড়ায়

স্ত্রী প্রজাতির এডিস এজিপটি মশার (যার শরীরে ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণু থাকে) কামড়ে ডেঙ্গু জ্বর ছড়ায়।

রোগের লক্ষণসমূহ

ডেঙ্গু জ্বর

ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণসমূহ হচ্ছে:

- জ্বর
- প্রচণ্ড মাথাব্যথা, চোখের পিছনে ব্যথা, মাংসপেশী ও অস্থিসন্ধিসমূহের ব্যথা
- ক্ষুধামন্দা
- সমস্ত শরীরে লাল রঙের চাকা (rash), বিশেষ করে বুকে ও উর্ধাঙ্গসমূহে
- বমি বা বমি-বমি ভাব হওয়া।

ডেঙ্গু হেমোরহেজিক জ্বর

ডেঙ্গু হেমোরহেজিক জ্বরের লক্ষণসমূহ ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণসমূহের মতই। আরো যেসব লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় সেগুলো হচ্ছে:

- পাকস্থলীর ব্যথা
- ঠাণ্ডা ও ফ্যাকাসে চামড়া
- নাক ও মুখের ভেতর দিয়ে রক্তক্ষরণ
- রক্তসহ বা রক্তছাড়া বমি
- অস্থিরতা বা ঘুম-ঘুম ভাব
- তীব্র/প্রচন্ড পিপাসা ও শ্বাসকষ্ট।

ডেঙ্গু জ্বরের প্রতিরোধ

যেহেতু ডেঙ্গু জ্বরের নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই সেহেতু এর প্রতিরোধই একমাত্র উপায়। দু'ভাবে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়: (১) মশার বংশ বিস্তারের জায়গাসমূহ ধ্বংসের মাধ্যমে অথবা মশার বংশ বিস্তার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এবং (২) মশার কামড় থেকে রেহাই পাবার মাধ্যমে।

ডেঙ্গু জ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর দু'টোই মশার কামড়ে হয় ও ছড়ায়। তবে রোগ দু'টি ছড়ানোর মশা দু'ধরনের। ম্যালেরিয়া রোগে নির্দিষ্ট সময় অন্তর-অন্তর প্রচণ্ড কাঁপুনিসহ জ্বর আসে। জ্বরের তীব্রতাও ডেঙ্গু জ্বরের তুলনায় বেশি থাকে। ম্যালেরিয়া রোগের নির্দিষ্ট চিকিৎসা রয়েছে। পক্ষান্তরে, ডেঙ্গু জ্বরের নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। রোগীকে প্রচুর পরিমাণে তরল ও পুষ্টিকর খাদ্য খেতে দেওয়া প্রয়োজন। উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষা এবং যথাসময়ে রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিলে রোগীকে সম্ভাব্য জটিলতা ও মৃত্যু-ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

গর্ভবতী মায়ের খাদ্য

(৭ম পাতার পর)

একজন সাধারণ মহিলা ও একজন গর্ভবতী মহিলার দৈনিক খাদ্য উপাদানের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো:

উপাদান	সাধারণ মহিলা	গর্ভবতী মহিলা
ক্যালোরি	২২০০	২৫০০
আমিষ (গ্রা.)	৫০	৬০
তেল (গ্রা.)	২০	৩০
ক্যালসিয়াম (মি.গ্রা.)	৪০০	১০০০
আয়রন (মি.গ্রা.)	৩০	৬০
ভিটামিন এ (মা.গ্রা.)	২৪০ (বিটা-ক্যারোটিন)	৩০০০
থায়ামিন (মি.গ্রা.)	১.১	১.৪
রিবোফ্লাভিন (মি.গ্রা.)	১.৩	১.৬
নিয়াসিন (মি.গ্রা.)	১৪	১৮
ভিটামিন সি (মি.গ্রা.)	৪০	৬০
ফলিক এসিড (মা.গ্রা.)	১০০	১৫০

গর্ভবতী মা ও তাঁর গর্ভস্থ শিশুর শরীর গঠনে সুষম খাদ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ-ব্যাপারে গর্ভবতী মা ও তাঁর পরিবারের সকলকে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। উদাহরণ হিসেবে গর্ভবতী মায়েদের উপযোগী একটি আদর্শ দৈনিক খাদ্য তালিকা পাশের কলামে দেয়া হলো।

খাবার সময়/বেলা	খাদ্য দ্রব্য	পরিমাণ
সকালের নাস্তা	আটার রুটি/পাউরুটি	৩টি মাঝারি আকারের
	ডিম ভাজা	১টা
	সবজি	১ কাপ
সকাল ১০ টায়	আটার রুটি/মুড়ি/চিড়া	১টি/২ কাপ/১ কাপ
	সবজি বা ডাল/কলা/দই	১ কাপ
দুপুরের খাবার	ভাত	২ কাপ
	মাছ/মাংস	২ টুকরা (প্রমাণ সাইজ)
	ডাল (মাঝারি ঘন)	১ কাপ
	শাক	১/২ কাপ
	সবজি	১ কাপ
বিকেলের নাস্তা	মুড়ি/চিড়া/নুডুলস/হালুয়া	১ কাপ
	ফল: কলা/আম/পেপে/আপেল	সাধারণ মাপের একটি
রাতের খাবার	ভাত	২ কাপ
	মাছ/মাংস	২ টুকরা
	ডাল	১/২ কাপ
	সবজি	১/২ কাপ
	সালাদ	ইচ্ছে মত
শোবার/ঘুমানোর আগে	দুধ	১ গ্লাস

পরিশেষে এ-কথা না বলে পারছি না যে একটি সুস্থ-সবল শিশু তথা দেশের আদর্শ সুনাগরিকের আশায় আমাদের সবাইকে গর্ভবতী মায়েদের খাদ্যের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। সুষম খাদ্য অবশ্যই প্রয়োজন, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে গর্ভকালীন সময়ে মা যেন সদা প্রফুল্ল থাকে। কোনো রকম বিষন্নতা বা হতাশা মায়ের চেয়ে গর্ভস্থ সন্তানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে, যা শিশুর জীবনে পরবর্তীতে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই সাথে-সাথে গর্ভবতী মায়ের মনও যাতে সব সময় প্রফুল্ল থাকে সে বিষয়েও পরিবারের সকল সদস্যকে তাকে সহযোগিতা করতে হবে।

সাপের কামড়

(১৬-এর পাতার পর)

সনাক্তকরণের জন্য তা রোগীর সাথে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

- বিষধর সাপের দংশনের এ্যান্টি-ভেনম ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আছে।

সাপের দংশন কিভাবে এড়ানো যায়

সাপ কেবলমাত্র আত্মরক্ষায় কিংবা উত্যক্ত করলে মানুষকে দংশন করে বিধায় সাপকে এড়িয়ে চলাই প্রতিরোধের অন্যতম উপায়। ঘাস বা ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে চলাফেরা করার সময় সাবধানে চলতে হবে। মাছ ধরার চাঁই বা জালের মধ্যে হাত দেওয়ার আগে সাপ আছে কিনা তা দেখে নিতে হবে। স্তূপাকৃত লাকড়ি অথবা খড় দেখে-শুনে নাড়াচাড়া করতে হবে। রাতে হাঁটার সময় আলো ও লাঠি সাথে রাখতে হবে। গরমের দিনে বাইরে শোবার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

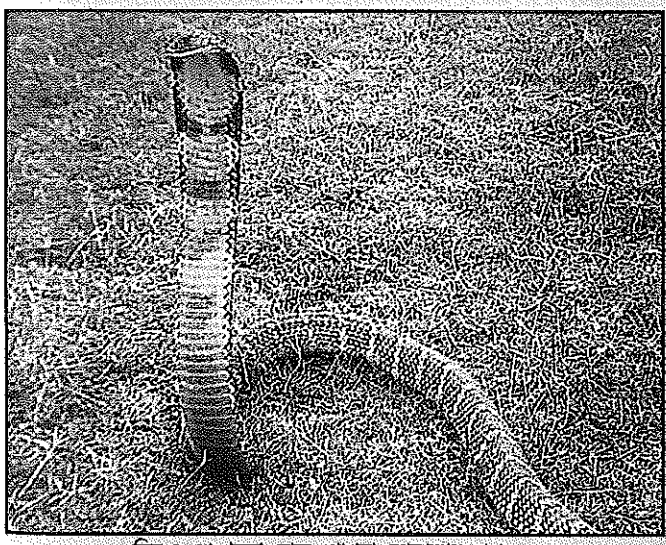

চিত্র ৪: শংখচূড়া, রাজ-গোখরা, কালান্দার সাপ

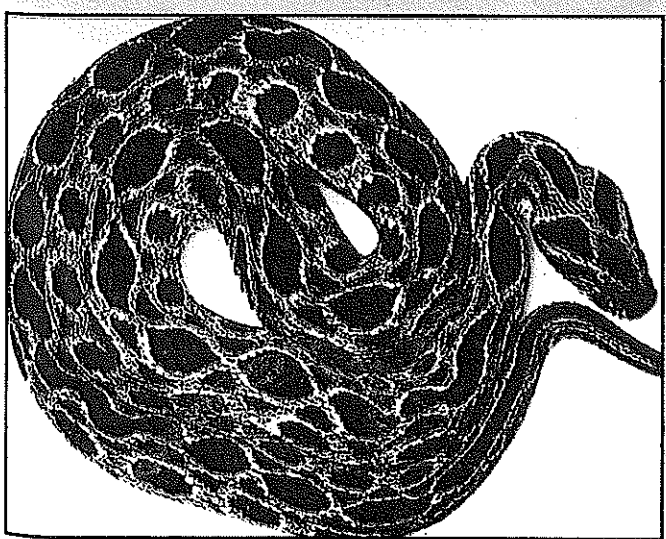

চিত্র ৫: গায়ে শিকলের শাড়িযুক্ত চন্দ্রবোরা

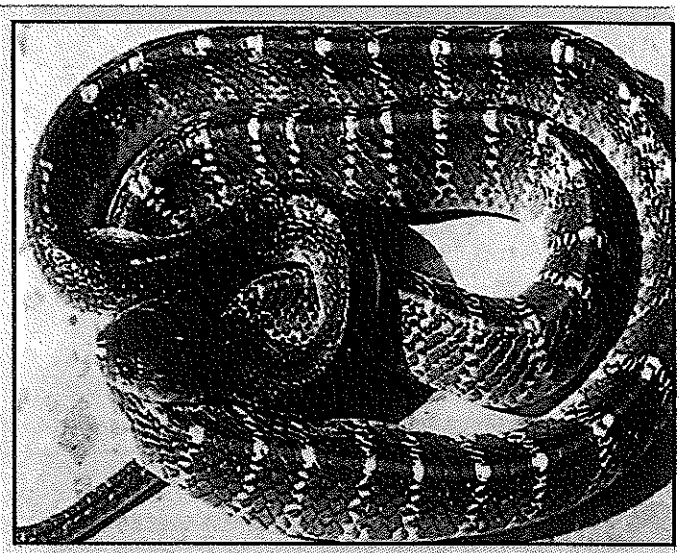

চিত্র ৬: কেউটে বা কেইট

চিত্র ৭: দু'টি বিষ দাঁতের চিহ্ন

চিত্র ৮: অবিষধর সাপের কামড়ের স্থানে অনেকগুলো আঁচড়ের চিহ্ন দেখা যায়

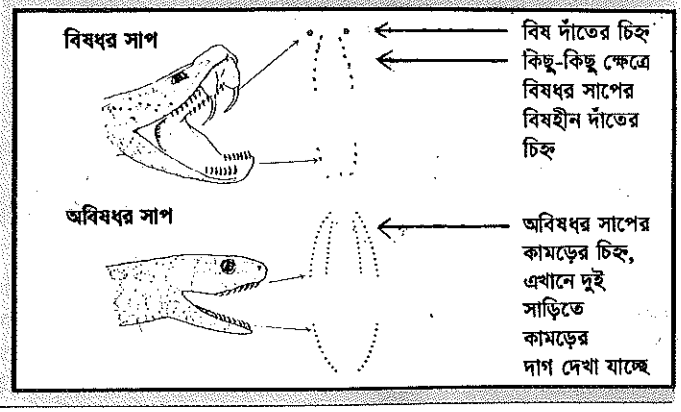

চিত্র ১-৮-এর সূত্র: ডা. এম.এ. ফয়েজ। সর্প দংশন ও এর চিকিৎসা। চট্টগ্রাম: জেসমিন আক্তার, ১৯৯৮

জেনে রাখা ভালো

সাপের কামড়ের প্রতিকার

লোকমান হেকিম ও মহসীন উদ্দীন আহমেদ

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে ও বন্যার সময় বিভিন্ন প্রকারের সাপের উপদ্রব দেখা দেয়। কখনো-কখনো সাপের কামড়ে লোক মারা যায়। তাই স্বাস্থ্যকর্মীদের সাপের কামড়ের প্রতিরোধ এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও সচেতন থাকা প্রয়োজন।

একটি হিসেব মতে, বাংলাদেশে কমপক্ষে ৮০ প্রজাতির সাপ রয়েছে। এদের সব প্রজাতিই বিষধর নয়। এরমধ্যে ১৫ প্রজাতির স্থলচর এবং ১২ প্রজাতির সামুদ্রিক সাপ বিষধর। এর মধ্যে জনগুরুত্ব-সম্পন্ন বিষধর হচ্ছে ৬টি। নিম্নে এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:

১. **গোখরা (কোবরা):** গোখরা সাপের গায়ের রং গাঢ় বাদামী কিংবা কালো হয়। এরা প্রশস্ত ফণা তুলে থাকে। ফণার উপর একটি বা দু'টি বলয় থাকতে পারে।

২. **রাজ-গোখরা, শংখচূড়া বা কালান্দার:** এ-ধরনের সাপ পৃথিবীর বৃহত্তম বিষধর সাপ। এদের রং হলদে থেকে জলপাই সবুজ হয় এবং ফণা অপ্রশস্ত। বাংলাদেশের পাহাড়ী এলাকায় এদের দেখা যায়।

৩. **সবুজ সাপ, বাঁশবোরা (পিট ভাইপার):** এদের গায়ের রং কম-বেশি সবুজ এবং মাথা ত্রিভুজাকৃতির হয়। এদের চোখ ও নাকের মাঝে একটি গর্ত আছে।

বিষধর সাপের কামড় চেনার উপায়

বিষধর সাপের দু'টি বড় ধরনের বিষ দাঁত আছে। এ-দাঁত দু'টি সাধারণ অবস্থায় মুখের ভেতর ভাঁজ হয়ে থাকে। সাপের চোয়ালের দু'দিকে দু'টি বিষথলি আছে। এই বিষথলি থেকে বিষনালী বেরিয়ে মিলেছে বিষ দাঁতে। সাপের বিষদাঁত দু'টি ইন্‌জেকশনের সুঁচের মত। এর ভেতর দিয়ে বিষ নির্গত হওয়ার ব্যবস্থা আছে। কোনো কারণে সাপ উত্তেজিত হলে বিষদাঁত দু'টি সামনের দিকে বেরিয়ে আসে। সাপ কামড় দিয়ে চোয়ালের মাংসপেশীতে চাপ দেয়। চাপের ফলে থলে থেকে বিষ বেরিয়ে নালার মাধ্যমে দাঁতের ভেতর দিয়ে তখন শরীরে প্রবেশ করে। তাই বিষধর সাপ কামড়ালে দু'টি বড় ক্ষত চিহ্ন দেখা যায়।

সাপে কামড়ালে কি করা আবশ্যক

মনে রাখতে হবে যে সাপের দংশনে বিষক্রিয়ার চেয়ে দংশনের আতংকেই বেশিরভাগ লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আরো মনে রাখতে হবে যে বেশিরভাগ সাপই হচ্ছে বিষহীন। তাই যথেষ্ট মনোবলের সাথে দংশনের পরিচর্যা করা জরুরী। সাপে কামড় দিলে নিম্নে উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

- দংশিত স্থানের উপরে চওড়া কিছু দিয়ে কেবলমাত্র একটি গিট দিতে হবে। প্রতি আধ ঘণ্টা পরপর আধা মিনিটের জন্য গিটটি আলগা করে দেওয়া যাবে।
- দংশিত স্থান মুছে নিয়ে ব্যান্ডেজ বা পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে আবৃত করতে হবে।

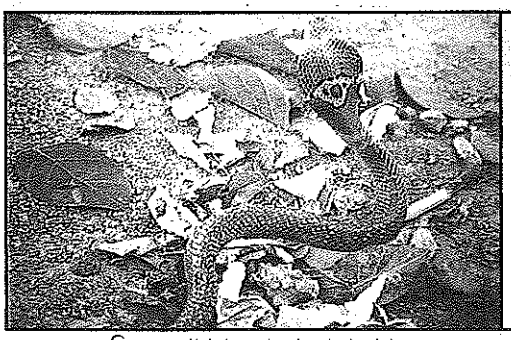

চিত্র ১: গোখরা, কোবরা, নাজা সাপ

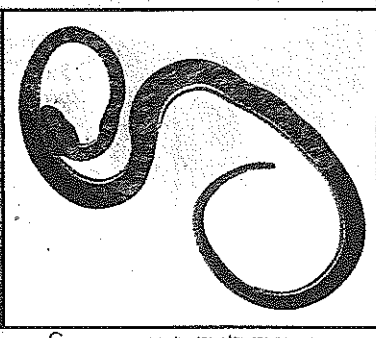

চিত্র ২: সবুজ সাপের গায়ের রঙ সবুজ

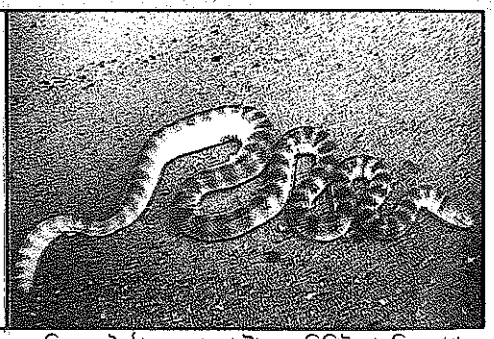

চিত্র ৩: বৈঠার মতো চ্যাপ্টা লেজবিশিষ্ট সামুদ্রিক সাপ

৪. **কেউটে (ক্রেইট):** এ-ধরনের সাপ ৫ প্রজাতির হয়। এদের মধ্যে কাল কেউটে ও শাকিনী সাপ অন্যতম। গায়ের কালচে রংয়ে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতির সাদা বলয় আছে এবং লেজ ছোট ও কিছুটা ভোঁতা হয়।

৫. **চন্দ্রবোরা (রাসেল্‌স ভাইপার) :** চন্দ্রবোরার গায়ের রং বাদামি থেকে হলুদাভ হয়। গায়ে শিকলের সারি থাকে। মাথা বড় ও ত্রিভুজাকৃতি এবং ঘাড় সরু হয়। বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গে এ-ধরনের সাপ বেশি দেখা যায়।

৬. **সামুদ্রিক সাপ:** সামুদ্রিক সাপের দেহে গোলাকার দানাদার আঁশ আছে। এদের চোখ ও নাসারন্ধ্র মাথার উপরের দিকে অবস্থিত এবং লেজ চ্যাপ্টা হয়। এ-ধরনের সাপ সমুদ্রে ও সমুদ্র উপকূলে দেখা যায়।

- পায়ে বা হাতে দংশন করলে বাঁশ বা কাঠের টুকরো দিয়ে স্প্লিট বেধে দংশিত স্থানের নড়াচড়া সীমিত করতে হবে। এতে করে রক্ত চলাচল কম হবে এবং বিষ মিশতে বিলম্ব হবে।
- দংশিত স্থান কেটে রক্ত বের করে দেওয়ার চেষ্টা না করাই ভাল। এতে করে নড়াচড়ায় বরং বিষ রক্তে মিশতে সহায়তা করবে।
- রোগীর কথা বলতে অসুবিধা হলে, নাকে কথা বললে কিংবা মুখে লালা ঝরলে কিছু খেতে না দেওয়া ভাল।
- ওঝার চিকিৎসার জন্য সময় নষ্ট না-করে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সাপটিকে মেরে থাকলে

(১৫-এর পাতায় দেখুন)

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা: অধ্যাপক ডেভিড এ. স্যাক; সম্পাদক: ডা: ফকির আঞ্জুমান আরা; ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: এম. শামসুল ইসলাম খান
সদস্য: ইউসুফ হাসান, ডা: মহসীন আহমেদ, ডা: হাসান আশরাফ, ড: দিলারা ইসলাম ও ডা: কামরুন নাহার; ডিজাইন: আসেম আনসারী
প্রকাশক: আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেল্‌থ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ, মহাখালী, ঢাকা ১২১২ (জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮২২৪৬৭, ৮৮১১৭৫১-৬০; ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৮২৩১১৬ ও ৮৮২৬০৫০; ই-মেইল: disc@icddrb.org

মুদ্রণে সেবা প্রিন্টিং প্রেস, মহাখালী, ঢাকা।